মৃত গোয়েন্দার স্বপ্ন

সুনীল পাল

রুদ্রলোক প্রকাশন
জীবনবীমা নগর, ২৪ পরগণা (উঃ)

উৎসর্গ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আজীবন নির্বিকল্প ভ্রমণ বীক্ষণ
মূল থেকে যথা উর্দ্ধে ওঠে মহীরুহ ;
অভ্রভেদী চতুষ্কোণ স্তুব অহরহ,
ভরি তোলে সত্ত্বা তব আকুতি ব্যঞ্জন।
দুর্গম ঐ গিরি লঙ্ঘি সুদূর তিব্বতে
সৌম্যকান্তি বৌদ্ধমূর্তি প্রোথিত হৃদয়,
কঠোর তপস্যা বলে শুধু দিগ্বিজয়,
পাণ্ডিত্য প্রবুদ্ধ আনে মহা মহা ব্রতে।

স্বদেশের বুকে আনি জ্বালিলে সে-শিখা,
অন্ধকার বিদূরিত আগত ভাস্বরে ;
মূঢ় শাসক শৃঙ্খল পরায় কোমরে ;
বিচারের প্রহসন ভেল্কি সলজ্জিতা।
অসাম্যের ধারা তবু প্রবহ অনঙ্গা,
রক্তনদী বয়ে চলে ভল্গা থেকে গঙ্গা।

এই লেখকের বই

চতুর্দশপদী

চরিত

মানস

ছড়াগাথা

টুকিটাকি

হ্রস্বদীর্ঘ

সূক্তিমালা

দ্যুতি

ছোটগল্প

অসুরনাশিনী

মৃত গোয়েঙ্কার স্বপ্ন

অযোধ্যার পথে

যেতে যেতে পথে

অনুগল্প

ঋকৃথ (কাফকা'র অনুবাদসহ)

উপন্যাস

মহাজাতি (১ম খণ্ড)

মহাজাতি (২য় খণ্ড)

কবিতা

রোজ রাতে কাক ডাকে

ভীষণ প্রদাহ পৃথিবীর বুকে

সম্পাদিত

প্রতিভাস (কবিতা)

সনেট-উহিনী (সনেট)

অনুসর্গ (অনুগল্প)

একুশ কাহিনী (ছোটগল্প)

প্রতিধ্বনি (ছোটগল্প) (যন্ত্রস্থ)

সূচীপত্র

মৃত গোয়েঙ্কার স্বপ্ন

বাঘা বাঘা ডাক্তারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে জয়রাম গোয়েঙ্কা মারা গেলেন ঠিক ভোর পাঁচটায়। সঙ্গে সঙ্গে গোয়েঙ্কা-ভবনে শোকের ছায়া নেমে এল। স্বামীর নশ্বর দেহের পাশে বসে দুহাতে নিজের বুক ও কপাল চাপড়াতে লাগলেন সীতাদেবী। দুজনের দুই কাঁধ ভর করে অঝোরে বিলাপ করতে লাগল তার দুই মেয়ে। গোয়েঙ্কাজীর পায়ের সামনে বসেছিল মোটা-সোটা তার দুই ছেলে। তারাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। প্রাসাদপ্রতিম বাড়ির দাসদাসী চাকর-বাকর সবাই চোখের জল মুছতে শুরু করে দিল বড়কর্তা চিরদিনের মতো চলে যাওয়ায়।

গোয়েঙ্কারা তিরিশের দশকের শেষের দিকে প্রায় লোটা-কম্বল নিয়েই ব্যবসা করতে কলকাতায় এসেছিল সেই সুদূর রাজস্থান থেকে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অনেকেই—সবাই তার দেশের লোক। তবে তার মধ্যে রাম·াস কোঠারিয়াদের সঙ্গেই গোয়েঙ্কাদের টক্কর লেগেছিল বেশি। কোঠারিয়াদের কালোয়ারী ব্যবসায় রাতারাতি রমরমা হওয়াটা গোয়েঙ্কারা লক্ষ্য করেছিল অনেক দিন থেকেই। তাই তারাও কালোয়ারী ব্যবসায় নেমে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী যেন ঝাঁপির মুখ খুলে সবকিছু উজাড় করে দিল তাদের সামনে।

এদিকে দেখতে দেখতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল চারিদিকে। ইউরোপের ঢেউ এদেশে এসেও লাগল। সবাই তখন ল্যাজ গুটিয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করে দিয়েছে জাপানী বোমার ভয়ে। জলের দরে বাড়ি-ঘর বিক্রি করে প্রাণের ভয়ে গ্রাম বাংলার শান্ত স্নিগ্ধ নীড়ে আশ্রয় নিল কলকাতার আদি বাসিন্দারা। সেইসব আদি

বাসিন্দাদের মতো ভীতু প্রকৃতির লোক ছিল কোঠারিয়ারা। তাই তারাও যুদ্ধের সময় তাদের কারবার ফেলে ঘরমুখো হল দূর রাজস্থানে। কারণ রামদাস কোঠারিয়া কথায় কথায় মাঝে মাঝে বলতেন, পহলে জান, বাদমে কাম।

কিন্তু গোয়েঙ্কারা সেই যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে রইল। যুদ্ধের সুযোগে দুহাতে তারা হাজার হাজার টাকা কামাতে লাগল কালোবাজারীর আশ্রয় নিয়ে। কলকাতা শহরের সেনট্রাল এভিন্যুর ধারে পেল্লাই পেল্লাই সব বাড়ি তারা কিনতে লাগল একেবারে জলের দরে। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ডামাডোলের পর থেকেই গোয়েঙ্কাদের ভাগ্য রাতারাতি ফুলে ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করল। আর সেই যে কোঠারিয়ারা ব্যবসার ঘোড়দৌড়ে গোয়েঙ্কাদের থেকে পিছিয়ে পড়ল, স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বর্ষেও সেটা আর কোনো দিন পূরণ করতে পারেনি তারা।

এহেন গোয়েঙ্কা-ভবন থেকে জয়রাম গোয়েঙ্কার মরদেহ নিয়ে যখন শোক মিছিল বের হল তখন সেটা বিশাল এক জৌলুসের আকার ধারণ করল নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে। মাঝে মাঝে ধীর স্থির ছন্দায়িত সুরে সেই চির পরিচিত ধ্বনি—'সইত্য হো ছিরি সইত্য হো ছিরি রাম নাম সইত্য হ্যায়' অথবা অন্য ভাষী কর্মচারীদের মুখে 'বল হরি হরিবল—বল হরি হরিবোল'। যেতে যেতে পথের দুধারে দাঁড়ানো ভিখিরীদের মুঠো মুঠো পয়সা দিতে দিতে শবযাত্রা এগিয়ে চলল নিমতলা শ্মশানের দিকে।

'অউম্' চিহ্নিত সেগুন কাঠের খাটে নরম বিছানার উপর কুড়ি বাইশ জন বাহকের কাঁধে চড়ে গোয়েঙ্কাজী চলেছেন তার শেষযাত্রা পথে। যেতে যেতে মনে হল খাটের চার কোণায় দামী সুগন্ধী গোছা গোছা ধূপকাঠি থেকে পুড়ে যাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী তীরবেগে আকাশ পথে ছুটে যাচ্ছে। আর চারজোড়া রাজহাঁস পাখা মেলে জয়রামজীকে তার খাটিয়াসহ শূন্য পথে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলের

স্তর ভেদ করে মেঘলোক পেরিয়ে মহাশূন্যের এক অভিনব রাজ্যে পৌঁছে গেলেন জয়রাম গোয়েঙ্কা।

দান-ধ্যান-পুণ্য-ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ জয়রাম গোয়েঙ্কা শেষে সশরীরে স্বর্গধামে এসে উপস্থিত। স্বর্গের দ্বাররক্ষী এসে দ্বার খুলে দিতেই তিনি স্বর্গলোকে প্রবেশ করলেন। ভিতরে ঢুকেই তার চক্ষু তো একেবারে ছানাবড়া! এরকম পাহাড়প্রমাণ ঐশ্বর্যের কথা তিনি কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেননি। মর্ত্যলোকে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শোষণ না করে কেউ কখনো বড়লোক হতে পারে না। আর কোঠারিয়া বা গোয়েঙ্কারা যে গরীবদের শোষণ করে বিত্তশালী হয়েছেন, একথা তারা অকপটে স্বীকারও করতেন। কিন্তু স্বর্গের ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না।

বিভিন্ন মণি-মাণিক্যখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসে আছেন স্বর্গের রাজা স্বয়ং ইন্দ্র। তার চারিদিকে শুধু ঐশ্বর্য-বৈভব। কোমরে ঘাগরা এবং বুকে সূক্ষ্ম কাঁচুলি পরিহিত দুই সুকেশিনী দুহাতে তাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। কারণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কিম্বা ইলেকট্রিসিটির নামগন্ধ পর্যন্ত নেই স্বর্গলোকে। তবে মর্ত্যলোক থেকে আগত মহাপুণ্যবানদের মুখ থেকে বিদ্যুতের বহুমুখী উপযোগিতার কথা শুনে মহাকাশে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ-শক্তিকে সংরক্ষণ করে দেবরাজ স্বর্গলোকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সবে পরিকল্পনা করছেন মাত্র। কারণ ঘরে ঘরে মর্ত্যলোকের মতো বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করলে অচিরেই স্বর্গলোক বিক্ষোভে ফেটে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত স্বর্গলোকে সব সময় একটা সাম্যভাব। কলকাতার মতো ভ্যাপসা পচা গরম নেই সেখানে। নেই কোনো কষ্টের বালাই। আর সেখানে মেঘেরা সবার কথা শোনে। আলোর দরকার হলেই মেঘের আস্তরণ সরিয়ে প্রদীপ্ত জ্যোতির ব্যবস্থা করা যায় সেখানে, আবার আস্তরণ টানলেই নিশুতির ঘন অন্ধকার। দীর্ঘপথে শ্রান্ত ক্লান্ত মনে গোয়েঙ্কাজীর বড্ড খিদে পেয়েছিল।

কিন্তু ম্যাগির মতো দুমিনিটে ভরপেট খাবারের এখানে তো কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল গোয়েঙ্কাজীকে। তারপর সোনার রেকাবে পঞ্চব্যঞ্জনসহ খাবারের থালা এসে যখন হাজির হল তার সামনে তখন তার তো একেবারে চক্ষু স্থির। এ তো রাজা বাদশার ভাগ্যেও জোটে না! ক্ষিদের জ্বালায় একেবারে যাকে বলে কব্জি ডুবিয়ে খেতে শুরু করলেন গোয়েঙ্কাজী।

সুগন্ধি মশলাযুক্ত পান চিবুতে চিবুতে তাচ্ছিল্যভরে মর্ত্যলোকের কথা রোমন্থন করতে লাগলেন গোয়েঙ্কাজী, সালা রামদাস একে নম্বরের বুরবাক আছে! হামার সঙ্গে টক্কর লিতে আসে। আরে বেওকুফ, জিন্দেগি কি বাত ছোড়্, আখ খুল কর দেখ্, অব তো হামারা মৌত হো গয়া—লেকিন আভিভি তু পারবে? বেওকুফ কাহাকা! কথাগুলো বলতে বলতে স্থূলদেহী গোয়েঙ্কাজী উত্তেজনায় একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠলেন। তারপর তিনি ভাবলেন এয়ার-কণ্ডিশানিং রহনেছে আচ্ছা হোতা। ঠিক হ্যায় ইন্দরকে সাথ বাতচিত করকে ম্যায় বিদ্যুৎ কা প্রবন্ধ্ কর লুঁগা। ইত্তনা খানাপিনাকে বাদ ঠাণ্ডা ঘরকা জরুরত হোতী হ্যায়!

আর মর্ত্যলোকে সেই সময় নিমতলা শ্মশানে নকল চন্দন কাঠের চিতায় নকল ভঁইসা ঘিয়ের প্রলেপে 'রাম নাম সইত্য হ্যায়', 'বল হরি হরি বোল' বলে গোয়েঙ্কাজীর মুখে আগুন দিচ্ছিল তার দুই ছেলে। সেই সঙ্গে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, কর্মচারী, শুভাকাঙ্ক্ষী, চাকর-বাকর, দাস-দাসী সবাই শেষবারের মতো তার প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করল বিলাপের নানান ভঙ্গিতে।

স্বর্গধামে সভাসদদের নিয়ে সেদিন দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। প্রথমে রাজ-বন্দনার পর শুরু হল মেনকার ভুবন-মোহিনী নাচ। সে কী নাচ! স্বচ্ছ সোনালী বস্ত্রের আস্তরণে মোড়া মেনকাকে এক রহস্যময়ী নারী বলে মনে হল। নাচের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ফুলে সজ্জিত বেণীর অগ্রভাগ তার পিঠের নিচে আছড়ে পড়ছে দেখে গোয়েঙ্কাজীর চিত্ত-বৈকল্য হবার উপক্রম হল। নাচতে নাচতে মেনকার

ঘর্মাক্ত শরীর দেখে গোয়েঙ্কাজী দেবরাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ইন্দরজী, আপনি স্বর্গধামমে ইলেকট্রিসিটিকা প্রবন্ধ্ করিয়া দিন। গর্মীমে বহুত তখলিফ হোতা হ্যায়।

ইন্দ্রদেবকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ইন্দর বলায় সভাসদদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। দেবগুরু বৃহস্পতি রেগে বললেন, এটা স্বর্গধাম—বুঝলে? মর্ত্যলোক নয়। ওরকম ম্লেচ্ছ ভাষা এখানে চলবে না। আর ইলেকট্রিসিটির মতো যবন ভাষারই বা মানে কী?

—হা হা, সো তো হামি জানে, বৃহজী। ইন্দর্ বহুত মিঠা বুলি আছে। তুলসীদাসজীকা ভাষা। আপনি কভি শুনিয়েছেন?

নিজের নামের বিকৃতিতে দেবগুরু বৃহস্পতি একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। রেগেমেগে তিনি বললেন, দূর হও, ম্লেচ্ছ কোথাকার। কে তোমাকে এখানে স্থান দিয়েছে?

—সাবাস বৃহজী, কুচ্ছু মোনে করবেন না—হামি যখন কলকাত্তা আসে, সেখানকার আদমিভী হামাকে বলেছিল, কে তোমাকে এখানে টিকিট দিয়েছে? আর এখন গোটা কলকাত্তা হামার পায়ে গোড় হোয়। কুচ্ছু বুঝলেন?

ব্যাপারটা আর বেশিদূর অগ্রসর হলে বিপদের সম্ভাবনা দেখে দেবরাজ কোনো রকমে সেটা সামাল দিয়ে বললেন, জয়রাম, আমি তোমার অসুবিধার কথা বুঝতে পারছি। একটু অপেক্ষা কর—শীঘ্রই স্বর্গধামে আমি বিদ্যুতের ব্যবস্থা করছি।

গোয়েঙ্কাজী বললেন, ধইন্যবাদ ইন্দরজী। আউর একঠো কথা হামি বলবে। আপনার যমরাজ বুড্ডা হয়ে গেল—আউর তার চেলা চিত্তরগুপ্‌ত্‌ভী। ওদের দুজনকে আপনি ছাটাই করিয়া দিন!

সভায় গুঞ্জন ভেদ করে বৃহস্পতি সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন, আরে মূর্খ! চিত্তর গুপ্‌ত্‌ নয়—বল চিত্রগুপ্ত। তারপর ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বক্রোক্তি করে বললেন, যমরাজ আর চিত্রগুপ্তকে বিদায় দিয়ে এখন থেকে আপনি জয়রামকে নিয়েই রাজত্ব করুন।

—আরে নহী নহী, কোই আদমীর জরুরত না হোবে। সোব কাম করবে কমপিউটার—মতলব যন্তর্ রাক্ষস্!

স্বর্গের সকলেই বলে উঠলেন, যন্ত্র-রাক্ষস! সে একাই সব কাজ করবে! এই কোটি কোটি মানুষের জন্ম-মৃত্যু, জীবন-লিখন, পাপ-পুণ্য তুলাদণ্ডে বিচারের পর স্বর্গ বা নরক বাস সব কিছু!

—হা হা, মশাই সব কুছু। তোবে আর বলছি কি! স্রেফ একটা বোতাম টিপবেন—ব্যস—আউর কুচ্ছু করতে হোবে না। সোব করবে কমপিউটার—ইয়ানি যন্তর রাক্ষস্। বুঝলেন?

ইন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু জয়রাম, এরকম যন্ত্র তো স্বর্গধামে নেই। এই যন্ত্র আমি পাবো কোথা থেকে? তাহলে উপায়? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—সে আপনি কুছু ভাববেন না। হামি কমপিউটার ফরমূলা মর্ত্যলোক থেকে পাচার করিয়া এখানে লিয়ে আসবে। কলকাত্তামে হামার যো কারবার আছে সেখানে ভী ছোটাসা একঠো হ্যায়। লেকিন শায়দ উসমে য়াহাকা কাম নহী চলেগা। ঠিক হ্যায় বোম্বাইসে হামি একঠো বড়া কমপিউটার দুনম্বরী করে এখানে লিয়ে আসবে।

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বললেন, পাচার, দুনম্বরী এসব কি শুনছি দেবরাজ! এর তো কোনো মানে বুঝতে পারছি না। স্বর্গলোকও কি শেষ পর্যন্ত রসাতলে যাবে?

দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু কিন্তু করছেন দেখে গোয়েঙ্কাজী বললেন, নারদজী, সারী দুনিয়া দুনম্বরসে ভরে গেলো। আপনি কুচ্ছু খবর রাখেন না। বুড্ডা হয়ে গেছেন—কোমর বেঁকে গেলো, ওই ঢেঁকি আর বীণা লিয়ে আর কোতোদিন চোলবে বলুন? আপনি রিটায়ার করিয়া লিন।

দেবরাজ একেবারে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন—জয়রাম, ইনি স্বয়ং দেবর্ষি নারদ। দ্যুলোক ভূলোক গোলক অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত খবর উনি আমাকে এনে দেন। তুমি কাকে কী বলছ?

—হা হা, সোতো হ্যায়! লেকিন নারদজীকে দাঁত পড়ে গেল, বাল পেকে গেল, চোখ অন্ধা হয়ে গেল ফির কুঁজোভি হয়ে গেল। আর চলে? আচ্ছা ইন্দরজী, আপনার এখানে নকরির বরস কুচ্ছু নেই—এই ধরুন ষাট/পয়ষট জ্যায়সা কানুনমে হ্যায়।

—না…মানে…সেরকম তো কিছু নেই এখানে।

—বাঃ বাঃ, বেশ রাজত্ব করিয়া গেলেন। পড়তেন কলকাত্তাকা কম্‌নিস্টদের পাল্লায়—তোবে মজাটা বুঝিয়ে দিতো। ওই লাল ঝাণ্ডার ডাণ্ডা দিয়ে আপনাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতো! আউর নকশাল হলে সোতো কথাই নেই। এক্কেবারে মুণ্ডু কাটিয়া লিবে!

—বল কি জয়রাম? এরকম অরাজকতা! তাহলে দেবর্ষিকে নিয়ে আমি কী করবো?

—নারদজীকে আপনি ছাঁটাই করিয়া দিন। পেনশন, গ্র্যাচুটি যো মিলবে, সো মিলবে। আউর হামি স্বর্গমে দূরদর্শনকা প্রবন্ধ্ করিয়া দিতেছি। আপনি বোতাম টিপে দ্যুলোক, ভূলোক, ইয়ানি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকা সব খবর ঘরে বোসে বোসে পেয়ে যাবেন।

গোয়েঙ্কাজী দেখলেন কমপিউটারাইজেশন ও মেকানাইজেশনের এমন মৃগয়াক্ষেত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা এখানে কোনো লেবার প্রবলেম নেই। তাই মুনাফার লেলিহান শিখা মনে মনে কল্পনা করে তার বিস্ফারিত চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় কোঠারিয়াদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তার বড়ই করুণা হল।

আর ঠিক সেই সময় নিমতলা শ্মশানে ধূপধুনো আর ভৈসা ঘিয়ের সংস্পর্শে গোয়েঙ্কাজীর চিতার লেলিহান শিখা 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি সহযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আকাশের দিকে।

গোয়েঙ্কাজীর পরিকল্পনামাফিক দেবর্ষি নারদ, নরকের যমরাজ ও তার মুন্সী চিত্রগুপ্তকে বরখাস্ত করার পর স্বর্গধামে ইন্দ্রদেব কমপিউটারাইজেশন ও মেকানাইজেশন পুরোপুরি সম্পূর্ণ করে ফেললেন। দূরদর্শনের

পর্দায় যখন দ্যুলোক, ভূলোক ও গোলকের ছবি বোতাম টেপার পর ভেসে আসতে লাগল অথবা কমপিউটার যন্ত্রে যখন কোনো মানুষের সারাজীবনের পাপ-পুণ্যের ফলাফল মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে লাগল তখন এই ব্যবস্থার কট্টর বিরোধী দেবগুরু বৃহস্পতি ও দেবর্ষি নারদ পর্যন্ত বিস্মিত হলেন।

নতুন নতুন উন্নত ব্যবস্থার প্রশংসা পঞ্চমুখে সকলের মুখে শুনে গোয়েঙ্কাজী দেবরাজকে একদিন বললেন—ইন্দরজী, দূরদর্শনমে সমাচারকা বাত ছোড়িয়া দিন। অসলী মজাতো গভীর রাতমে।

অবাক বিস্ময়ে ইন্দ্রদেব প্রশ্ন করলেন, গভীর রাতে !

—হা হা, গভীর রাতমে !

—কী রকম, কী রকম !

—আরে ইন্দরজী, বালবাচ্চা যখন সব ঘুমিয়ে যাবে, তখন দেখবেন দের রাত কী ছবি—একদম আসলি চিজ। ইয়ানি রাতমে দরওয়াজা বন্দ্ কোরবার পর আপনা বিবিসে যো যো হোতা হ্যায় একদম সো সো! হা হা হা—বড়ী মজা, ইন্দরজী, বড়ী মজা।

—কী বলছ জয়রাম ?

—হা হা, ঠিকই বলিতেছি। মর্ত্যধামকা সেণ্টার খুলিয়া লিবেন, দেখবেন য়ুরোপকা ইস্পেশালি ছোটা ছোটা কম্‌নিস্ট দুনিয়াকা পিকচার—আহ্ ক্যা বাতায়ু—ইসকা কোই জবাব নহী !

—সে কী! আমরা তো বরং শুনেছি কমিউনিস্ট দুনিয়ায় বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ায় এসব চলে না।

—আরে ছোড়িয়া দিন। ওখানেভী হামরা ঢুকিয়ে পড়েছি। অভি উহাভী চলতা হ্যায়। আউর হামারা দোস্ত গর্বচভ্ আনেকা বাদ আউর জ্যায়দা চলতা হ্যায়।

গোয়েঙ্কাজী ও দেবরাজ ইন্দ্রের এই আলোচনা হাড় জিরজিরে বৃহস্পতি ও নারদের শিরা-উপশিরায় যেন হরমোন ইনজেকসনের কাজ করল। তারাও মনে মনে ভাবলেন যে, দেবরাজকে বলে যদি একসেট

টিভির ব্যবস্থা তাদের শোবার ঘরে করা যেত তা হলে গভীর রাতের ব্যাপার-স্যাপার সব দেখা যেত!

সবকিছু সম্পন্ন করার পর স্বভাবতই দেবরাজ ইন্দ্র গোয়েঙ্কাজীর প্রতি অতি প্রসন্ন হলেন এবং স্বর্গধামের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাকে বর দিতে চাইলেন।

গোয়েঙ্কাজী দেবরাজকে বললেন, আপনি প্রসন্ন্ হইয়েছেন, ইহাতে হামি সন্তুষ্ট্ আছি। আউর আপনি প্রসন্ন্ হইয়ে হামাকে যখন কুছু দিতে চান তো সো হামি লেবে। ইন্দরজী, হামি শুনিয়েছি কি, মর্ত্যধামকা মাফিক স্বর্গমেভী নিষিদ্ধ পল্লীকা ইন্তজাম হ্যায়! আগর আপকা মেহেরবানি হোবে তো...এই ছোটামোটা দাসকা উপর কুচ্ছু দয়া রাখবেন।

—হা হা হা হা, বুঝেছি জয়য়াম...আমি সব বুঝেছি! আমার মতো তোমারও দেখছি ও রোগ আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হবে হবে—সব হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

পরে দেবরাজ এক পরিচারিকাকে ডেকে গোয়েঙ্কাজীকে রম্ভার কুটিরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। কৃতজ্ঞতা সহকারে গোয়েঙ্কাজী ইন্দ্রের দিকে দুহাত জোড় করে মাথা ঈষৎ ঝুঁকে আস্তে আস্তে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। তারপর উৎফুল্ল চিত্তে ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন ত্রিভুবনময়ী রম্ভার কুটিরের দিকে।

যেতে যেতে মর্ত্যের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল গোয়েঙ্কাজীর। তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিসওয়ালজীর সঙ্গে একবার তিনি ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে গিয়েছিলেন ও-কম্ম করতে। বিসওয়ালজী তাকে বলেছিলেন—ওহা সব কুছ ফিরি—ইসিলিয়ে ফিরি স্কুল কহলাতা হ্যায়। আউর ওহা ইতনা খুবসুরত লেড়কিয়া হ্যাঁয় কি আপনা পছন্দ মাফিক চুন কর কোই লেড়কীকো আপ রুপয়াসে খরিদ সকতে হ্যাঁয়।

কিন্তু গোয়েঙ্কাজীর কপাল এমনই মন্দ যে ঠিক সেদিনই সেই নিষিদ্ধ পল্লী একেবারে তোলপাড় করে ফেলল লাল বাজারের স্পেশাল

স্কোয়াড। দরদাম করার পর সবে তিনি এক ইরানী মাগীর বিছানায় উঠেছেন, অমনি 'পুলিশ পুলিশ' বলে চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল। সাময়িক উত্তেজনা ছাড়াও একদিকে ইরানী মাগীর তাড়া, অন্যদিকে পুলিশের ভয়ে গোয়েন্কাজী একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গেলেন।

পাশের ঘরেই বিসওয়ালজী ছিলেন। ব্যাটা তার রোগাপটকা চেহারা নিয়ে এই গোলমালের মধ্যে কোথায় যে সটকে পড়েছেন সেটা কোনোমতে আর হদিশ করতে পারেননি গোয়েন্কাজী। বাইরে বেরিয়ে তার বিশাল দেহটা নিয়ে পালাতে গিয়ে হাইড্র্যাণ্টের ঢাকনিতে হোঁচট খেয়ে হঠাৎ ধরাশায়ী হলেন তিনি। আর ঠিক সেই ফাঁকে পেছন থেকে তার চুলের মুঠি ধরে পুলিশ সার্জেন্ট খেঁকিয়ে উঠল, এই শালা শূয়ারকা বাচ্চা—চল্।

—সীতারাম, সীতারাম! পুলিশ সাহাব, ম্যায়নে কুছ নহী কিয়া।

—কুছ নহী কিয়া! শালা!

—জি পুলিশ সাহাব, ম্যায় বেকসুর হুঁ।

—বেকসুর হুঁ! চল্ শালা, রাণ্ডীকা বাচ্চা—শালা, রাণ্ডীপাড়ায় এয়োছ সীতারাম করতে!

গোয়েন্কাজী দেখলেন ব্যাপার-স্যাপার খুবই গুরুতর। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে এক গোছা নোট পুলিশের হাতে গুঁজে দিয়ে সে-যাত্রায় কোনো রকমে তিনি রক্ষা পেলেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি—শুধ্ শুধু এক গুচ্ছের টাকা দণ্ড দিতে হয়েছিল।

সেই বিসওয়ালের উদ্দেশ্যে মনে মনে কাঁচা খিস্তি দিতে দিতে গোয়েন্কাজী এখন চলেছেন স্বর্গের নিষিদ্ধ পল্লীতে—রম্ভার নিকুঞ্জ আলয়ে, দেবরাজ ইন্দ্রেরও মাঝে মাঝে স্বয়ং যেখানে আগমন হয়।

রম্ভার কুঞ্জটি অতি মনোরম। নানা রকমের লতা-গাছ দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ভিতরে ঢুকতেই বিচিত্র-ফুলের সমাবেশ। তার মনোরম গন্ধে চারদিক একেবারে ম' ম' করছে। এদিক-ওদিকে নানান রঙের প্রজাপতি একবার এ-ফুল আর একবার

সে-ফুলে বসে মধু খাচ্ছে।

গোয়েঙ্কাজী দেখলেন রম্ভা সবে স্নান করে খোলা চুলে তার ঘরের বারান্দায় টবের গাছে ঘাড় নিচু করে জল সিঞ্চন করছে। কাঁচুলি-রহিত বুক থেকে খুলে পড়েছে তার ভেজা শাড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে সোনালী দুটি স্তন টকটকে আপেলের মতো ঝুলছে।

এই দৃশ্য দেখে গোয়েঙ্কাজী তাড়াতাড়ি রম্ভার বুকের শাড়ি বিন্যস্ত করে নিমেষে তাকে ঘরে যেতে নির্দেশ দিলেন। পুষ্পশয্যা বিছানো পালঙ্কের চারকোণে চারটি দণ্ডকে মনে হল যেন কামদেব পুষ্প-ধনু হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইসব দেখে প্রায় মাথা ঘুরে গেল গোয়েঙ্কাজীর। বিদ্যুৎ গতিতে রম্ভাকে সেই শয্যার উপর ফেলে সজোরে সম্ভোগ করার পর ক্ষণপ্রভার মতোই আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তিনি।

স্থূল দেহভারে নিষ্পেষিতা রম্ভা মনে মনে ভাবতে লাগল, এই মর্কটটাকে দেবরাজ কোত্থেকে জোগাড় করলেন। আরে বাবা এসেছিস আয়, একটু বোস্, দুটো কথা বল্, আদর কর, আঘ্রাণে-স্পর্শনে-চুম্বনে আবিল করে তোল্—না এসেই একেবারে ঘটং ঘটং!

রম্ভার দেহ সম্ভোগ করার পর কিন্নর দেওয়া পান চিবুতে চিবুতে গোয়েঙ্কাজী ফিরছেন নিজের নিলয়ে মর্ত্যলোকের কোঠারিয়া বাজুরিয়া ও বিসওয়ালদের অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে। ওখানে প্রতিযোগিতা তো নয় যেন কুকুরের কামড়া-কামড়ি। আর এখানে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একমেবাদ্বিতীয়ম্। রম্ভার দেহের রোদা গন্ধ অনুভব করতে করতে তিনি ভাবছেন মর্ত্যে এইসব করতে কত ঝক্কি কত ঝকমারি। কিন্তু স্বর্গে সে-সবের কোনো বালাই নেই। বস্তুত স্বর্গে সুখভোগ আছে কিন্তু কোনো দুর্গতি বা দুর্ভোগ নেই। আরাম কেদারায় বসে বসে ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির রেখা টেনে চোখ বুজে গোয়েঙ্কাজী ভাবছিলেন রম্ভার নিকুঞ্জে আবার কবে যাবেন।

আর মর্ত্যে সেই সময় গোয়েঙ্কজীর আধপোড়া মরদেহ আছোলা

বাঁশের আঘাতে একেবারে ছত্রখান হয়ে গেল। মূর্তিমান চণ্ডালের মতো দেখতে গদাই বলে উঠল, কালোদা, শুধু মাজা ভেঙে দিলে হবে না—এক বাড়িতে মাথাটা ফাটিয়ে মগজ বের করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে 'বল হরি-হরিবোল' চিৎকারে যণ্ডামার্কা কালো গাঁটযুক্ত বাঁশের আঘাতে গোয়েঙ্কাজীর মাথাটা একেবারে চৌচির করে ফেলল।

স্বর্গধামে এখন গোয়েঙ্কাজীর একচ্ছত্র আধিপত্য। বস্তুত স্বয়ং ইন্দ্রদেব ছাড়া তার আর কোনো প্রতিযোগী নেই বললেই চলে সেখানে। কাজেই স্বর্গধামে সভাসদদের মধ্যে গোয়েঙ্কাজীর স্থান পাকাপোক্তভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। এবং এই মর্মে এক নির্দেশনামাও সবার সমক্ষে জারি করলেন স্বয়ং দেবরাজ।

স্বর্গধামে যখন সেই নির্দেশনামা পাঠ করা হচ্ছিল তখন বৃহস্পতি নারদের কানে কানে বললেন, শালা হারামির বাচ্চা! স্বর্গধাম একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল।

নারদের কানে কথাগুলো খট করে বাজতেই তিনি বলে উঠলেন, দেবগুরু! এই ম্লেচ্ছ ভাষা আপনার মুখে! একি সত্য? আমি স্বর্গলোকে, না স্বপ্নলোকে?

—শালা হারামির গাছ। তোমাকে আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়ল? আর সবার উপরে বসানো হল মর্ত্যের এই মর্কটটাকে!

—হ্যাঁ, ভাগ্যে এও ছিল! এও দেখতে হল! কিন্তু আমি ছাড়বো না। সোজা চলে যাবো গোলকধামে। প্রভুর নিকট নালিশ করবো। দেখি এর কোনো বিহিত হয় কিনা।

—হ্যাঁ, তাই করো। আর সহ্য হয় না। আবার রম্ভাকে দিয়ে এই মর্কটটার মনোরঞ্জন করা হচ্ছে। হবে না—বলি রতনে রতন চেনে। মনে নেই? সেই মুনিপত্নী অহল্যার কথা? গভীর রাতে সেই সতীর সতীত্ব নষ্ট করেছিল কে? এই ইন্দ্র না! ছি-ছি-ছি, স্বর্গের মান ইজ্জত বলে আর কিছু রইল না! যাক সে-সব কথা। তুমি আজই গোলক অভিমুখে যাত্রা করো।

গোলকে তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তিনজনই উপস্থিত। 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে দেবর্ষি নারদ সেখানে হাজির হলেন। তারপর স্বর্গের ঘটনা বেশ রঙ চড়িয়ে বর্ণনা করলেন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে। নারদের কথা শুনে ব্রহ্মা বলে উঠলেন, দেখুন দেবর্ষি, ব্যাপারটা আপনারা স্বর্গেই মিটিয়ে ফেলুন। দিনকাল খুবই খারাপ। মর্ত্যে দিন দিন যেসব অবিশ্বাস্য আবিষ্কার হচ্ছে তাতে আমরাও চিন্তিত—রীতিমতো শংকিত। কোন্ দিন তার ঢেউ এখানেও এসে পড়ে তার ঠিক নেই!

নারদ—এসে পড়ে কী বলছেন, প্রজাপতি! গোয়েঙ্কাজীর কল্যাণে স্বর্গে তো ইতিমধ্যেই টিভি এসে গেছে। এখন সেখানে ঘরে ঘরে টিভি! আর জানেন? গভীর রাতের সব ব্যাপার-স্যাপার দেখানো হচ্ছে সেই সোনালী পর্দায়!

পাশে বসা বিষ্ণুর পাছায় চিমটি কেটে লক্ষ্মী তার কানে কানে বললেন, বুঝেছ, গভীর রাতের ব্যাপার-স্যাপার সব দূরদর্শনের পর্দায় উঠে আসছে। খুব সাবধান! তুমি যা সব কর, সে-সব দেখলে ভগবান বলে কেউ মান্যি করবে না।

লক্ষ্মীর চোরাহাসি আর চোখ পিটিপিটি দেখে পার্বতী শিবের কানে কানে বললেন, বুঝলে ভোলাজী! এখন থেকে আমাদেরও সাবধান হতে হবে। তোমার তো আবার নেশাভাঙ করলে কোনো হুঁশই থাকে না। শোবার পরই ল্যাংটা-ট্যাংটা হয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই কর!

নারদ আবার বলে উঠলেন, শুনেছি রোবট নামক দানব এনে নাকি সেই মর্কট সবাইকে শায়েস্তা করবে!

ব্রহ্মা—রোবট! রোবট আবার কি?

নারদ—রোবট হচ্ছে দানবীয় যন্ত্র যা বোতাম টেপার পর যে কোনো পাহাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে আবার প্রয়োজনে যে-কোনো দৈত্যের ঘাড় পর্যন্ত মটকাতে পারে!

ব্রহ্মা—শেষ পর্যন্ত মানুষ জীবসৃষ্টি করতেও সক্ষম হল! তাহলে তো আমাদের আর কোনো গুরুত্বই রইল না!

শিব—কোনো ভয় নেই। আমি সব ধ্বংস করে ফেলবো। কারো কোনো চিহ্ন রাখবো না মর্ত্যলোকে।

নারদ—সাবধান, সাবধান ভগবন! ঐ কাজটি করতে যাবেন না। ঐ যে রোবট! বোতাম টেপার পর তার যে কোনো একটা লক্ষ কোটি যোজন পেরিয়ে এই গোলকধামের যে কোনো লোকের ঘাড় মটকে দেবার ক্ষমতা রাখে। এমন কি গোটা গোলকধাম পর্যন্ত লণ্ডভণ্ড করে ফেলতে পারে।

বিষ্ণু—বল কি নারদ। এই রকম সব ব্যাপার-স্যাপার। তবে আমার মনে হয় প্রজাপতি ব্রহ্মার কথাই ঠিক। স্বর্গের ঝামেলা এখানে আনা ঠিক হবে না। ওটা ইন্দ্রকেই মিটিয়ে ফেলতে বল!

কাজেই প্যাচ-আপ ফরমুলা নিয়েই মহর্ষি নারদকে গোলক থেকে ফিরতে হল বিক্ষুব্ধ অন্তরে। নারদের মুখে সবকিছু শুনে দেবগুরু বৃহস্পতি গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে রোষে দুঃখে ফেটে পড়ে তিনি বললেন, শুধু মর্ত্যে নয় এখন দেখছি এই স্বর্গেও কল্কি অবতার হতে যাচ্ছে! কীইবা করা যাবে—স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যেখানে বিমুখ! তখন তো এটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মর্ত্যলোকী কায়দায় স্বর্গধামে গোয়েঙ্কাজীর জীবন প্রতিষ্ঠা একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে গেল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের আশীর্বাদে এখন আর তার কোনো বাধা বা কোনো অন্তরায় নেই। সামনে পড়ে রয়েছে শুধু এগিয়ে চলার অবাধ গতি। আর সেই শুভ অবসরে গোলক-দ্যুলোক থেকে সবিনয়ে হাত-জোড়-করা প্রয়োজনে মাথা নিচু-করা গোয়েঙ্কাজীর মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল মহাকাশ থেকে।

এদিকে মর্তলোকে গোয়েঙ্কাজীর চিতাভস্ম গঙ্গার পবিত্র জলে সমর্পণ করে পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই ঘরে ফিরল তার শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে। সবার মুখেই সুরেলা গলায় সমবেত কণ্ঠে সেই চির পরিচিত ধ্বনি—'সইত্য হো ছিরি সইত্য হো ছিরি রাম নাম সইত্য হ্যায়'—'বল হরি, হরিবোল—বল হরি, হরিবোল'।

সগর-বংশ

কপিল মুনিকে সন্তুষ্ট করে সগরবংশের ভস্মীভূত ষাট হাজার সন্তানদের উদ্ধার করতে ভগীরথ স্বর্গ থেকে স্বয়ং গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার মানসে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন।

কৈলাশ পর্বতে ধ্যানমগ্ন মহাদেব চোখ খুলে সামনে ভগীরথকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, শুধু সগরবংশের সন্তানদের উদ্ধার করার জন্যই কি তুমি গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে যেতে এসেছ?

—আজ্ঞে ভগবন! আমাব জীবনের সাধনাই ছিল কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত আমার ষাট হাজার পূর্বপুরুষদের জীবন পুনরায় দান করা।

—ব্যস! শুধু তোমার সগরবংশের উদ্ধার করলেই হবে? আর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কথা কিছুই মনে আসেনি তোমার?

—আজ্ঞে! অতদূর তো ভাবিনি, দেবাদিদেব!

—তবে আমার জটা থেকে গঙ্গাকে আমি মুক্তি দেবো না। শুধু সগরবংশের মুক্তির জন্য গঙ্গা মর্ত্যে যাবে না। যদি বিশ্বের মুক্তির কথা তুমি আমাকে দাও, তবেই আমি গঙ্গাকে মুক্ত করব।

ত্রিকালদর্শী মহাদেবের ত্রিনয়নের দিকে তাকিয়ে ভগীরথ তার পায়ে মাথা নত করে বললেন, সত্যিই আপনি দেবাদিদেব! আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি—শুধু সগরবংশের নয়, সমস্ত মানব জাতির উদ্ধারের জন্যই আমি গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে যাবো—আমি আপনার কাছে শপথ করছি।

ভগীরথের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে জটাজুট মহাদেব গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন তার মাথার জটা থেকে। মঙ্গলশঙ্খ বাজাতে বাজাতে ভগীরথ

গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যের দিকে রওনা দিলেন।

কিছুদূর যাবার পর জহ্নুমুনির ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তিনি গঙ্গাকে ফের রুখে দিলেন। ভগীরথ জহ্নুমুনির কাছে যেতেই তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন—বৎস, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বড় যে তরতর করে গঙ্গাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছ ?

—আজ্ঞে! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ? কী বলছেন, মুনিবর ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

—কিছুই বুঝতে পারছ না! দেবাদিদেবকে তুমি কী কথা দিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে! তাব কাছে আমি শপথ করেছি যে শুধু সগরবংশের নয়; পরন্তু সমস্ত মানব জাতির উদ্ধারের জন্যই গঙ্গাকে আমি মর্ত্যে নিয়ে যাচ্ছি।

—তবে ? দেখ বৎস, দেবাদিদেব থাকেন হিমালয়ের উঁচুতে অর্থাৎ একেবারে চূড়োয়। বারোমাস সেখানটা তো বরফেই ঢাকা থাকে। তাই জনপ্রাণী বলে কিছু নেই সেখানে। কিন্তু আমি থাকি হিমালয়ের নিচে। সবুজ বনানী ঘেরা গভীর অরণ্যে বন্যপশু তুমি নিশ্চয়ই এখানে দেখে থাকবে। আর বন্যপশু থাকলে মানুষও অবশ্যই রয়েছে। তাদের খোঁজখবরই যদি না করলে, তবে তাদের মুক্তির কথা বলছ কোন্ মুখে!

জহ্নুমুনির কথায় ভগীরথ যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হলেন এবং 'আজ্ঞে এক্ষুণি দেখছি' বলে হিমালয়ের কোলে লালিত পাহাড়িয়াদের জীবন-যাপন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি তক্ষুণিই বেরিয়ে পড়লেন।

খানিক দূর যেতেই তিনি দেখতে পেলেন পাথুরে মাটিতে শক্ত হাতে কাঠের লাঙল টানছে দীর্ঘকায় দুটি লোক আর পেছন থেকে পেশীবহুল আরও একটি লোক 'হেই হেই' করে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই কঠোর শীতেও দরদর করে ঘাম ঝরছে তাদের দেহ থেকে। কোলের কাছে রাখা আপন শিশুর মতো প্রিয় দানা সেই পাথুরে মাটিতে পেছন পেছন ছিটিয়ে দিচ্ছে এক সুন্দরী রূপসী।

মধ্যাহ্ন রোদের প্রখর তাপ তার মুখের উপর পড়ে একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছে সেই রূপসী আর সেই ঘাম টপটপ করে পড়ছে তার বুকের উপর। পশমী সেমিজে ঘেরা তার স্তনযুগল পুরোপুরি ভিজে গেছে ফোঁটা ফোঁটা সেই ঘামে। মনে হচ্ছে কোলের মধ্যে রাখা তার সন্তানকে সস্নেহে সে যেন দুধ খাওয়াচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল ভগীরথের মন। ভারাক্রান্ত মনে তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা এখানে কী করছো?

রক্তিম গেরুয়া পোষাক পরা ভগীরথকে দেখে প্রায়বৃদ্ধ সেই পাহাড়িয়া জোড়হাতে নমস্কার করে তাকে বলল—ভগবন, আমরা এখানে রামদানা চাষ করছি। ফলমূল খেয়ে আর বাঁচিনে গো, দেব! তাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই পাথুরে মাটিতে আমরা রামদানা রোপণ করছি।

—এই পাথুরে মাটিতে চাষবাস হয়? কাছে-পিঠে তো কোথাও জল দেখছি না।

—এই পাথুরে মাটিকে বশে আনা কি যে-সে কথা, ভগবন! গায়ের রক্ত জল করে তবে দু'মুঠো খেতে পাই।

—আচ্ছা তোমরা থাকো কোথায়?

—কেন? যেখানে পাহাড়ের গুহা আছে সেখানে। আর যেখানে নেই, সেখানে পাইন, ফার, বিচ আর অন্যান্য গাছের তলায় গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকি।

—সে কি!

—আজ্ঞে, হ্যা।

—আচ্ছা, তোমাদের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে?

—লেখাপড়া! সে কী বস্তু, ভগবন?

—সে কি! লেখাপড়ার নামই শোননি কখনো?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, অসুখ-বিসুখ করলে তোমরা কী কর?

—আজ্ঞে, ভগবানকে ডাকি। তিনিই সব সমস্যার সমাধান করে দেন।

—তোমরা কবিরাজ-বদ্যি কিম্বা কোনো ওষুধের নাম কখনো শোননি?

—আজ্ঞে না।

হিমালয়ের বুকে বসবাসকারী পাহাড়িয়াদের দুঃখ-কষ্ট দেখে ভীষণ আহত হল ভগীরথের মন। পেটে দু'মুঠো খাবার নেই, পরনে ভাল বস্ত্র নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, এমনকি রোগের কোনো ওষুধ পর্যন্ত নেই!

এইসব কথা চিন্তা করতে করতে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল তার মন। পাহাড়িয়াদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের লাঘব সেই মুহূর্তে কী করে করা যায় আকাশ পাতাল ভেবেও তিনি স্থির করতে পারলেন না।

অতিবৃদ্ধ সেই পাহাড়ী মানুষটিকে ভগীরথ বললেন, আচ্ছা ধরো আমি যদি তোমাদের চাষবাস করার জন্য জলের ব্যবস্থা করে দিই।

—তবে তো আমরা বেঁচে যাই, ভগবন!

—হ্যা, শীতের মধ্যে তোমরা কিন্তু আর গাছের তলায় থেকো না। বনের কাঠ, বাঁশ, লতাপাতা, খড়কুটো যা পাও, তাই দিয়ে ঘর তৈরি করে বাস করো।

—কিন্তু ভগবন, খাবার মতো শস্যই হয় না—অতো খুরকুটো পাই কোত্থেকে বলুন?

—জলের ব্যবস্থা হলে দেখবে ফসলের আর কোনো অভাব হবে না। সব ব্যবস্থাই আমি করে দিচ্ছি।

—বলেন কী ভগবন! জলের! জলের সব ব্যবস্থা!

—আর হ্যা, কৈলাশ থেকে আসার সময় নন্দি-ভৃঙ্গি আমাকে কিছু ভাঙদানা দিয়ে বলেছিল—ভাঙ গাছের পাতা থেকে সিদ্ধি করে খেলে অসুখ-বিসুখ সব সেরে যায়।

—বলেন কি ভগবন! তাহলে সেই ভাঙদানা আমাদের দু'চারটে

দিন! আমরাও পুঁতে দিই যাতে দেবাদিদেবের সর্বরোগহর মহৌষধ আমরাও পেতে পারি।

—কিন্তু ভগবন, জল না হলে তো চাষবাস কিছুই হবে না—তা সে রামদানাই হোক আর ভাঙদানাই হোক।

—সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। তোমরা কিচ্ছু ভেবো না।

ধ্যানস্থ জহ্নুমুনিকে সবিস্তারে সবকিছু বলার পর ভগীরথ প্রস্তাব দিলেন, মুনিবর, গঙ্গাকে আপনি মুক্তি দিন। গঙ্গার অসংখ্য কেশদাম থেকে অজস্র ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করে আমি তাকে মর্ত্যে নিয়ে যাবো। সেই ঝর্ণাধারা থেকে পাহাড়ের মানুষগুলোর চাষবাস করার, ঘরদোর বানাবার এমন কি রোগের ওষুধ তৈরি করার সব রকম সুযোগ থাকবে।

ভগীরথের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি গঙ্গাকে তার জানু থেকে মুক্তি দিলেন এবং ভগীরথও দুই হাতে মঙ্গলশঙ্খ বাজাতে বাজাতে জাহ্নবী বা গঙ্গাকে পুনরায় মর্ত্যের দিকে নিয়ে চললেন।

এইভাবে এগুতে এগুতে পর্বতের সানুদেশে এসে ভগীরথ লক্ষ্য করলেন সহস্র সহস্র ঝর্ণাধারাপুষ্ট গঙ্গা তার কলধ্বনিসহ আস্তে আস্তে বেগবতী স্রোতস্বিনী রূপ ধারণ করেছে। অদূরে সেই ধূসর মলিন রূপে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে ষাট হাজার সন্তানের ভস্মীভূত চিতাভস্ম। আর কিছু দূর এগুলেই ভস্মীভূত সগর-সন্তানগণ গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবে—এই কথা চিন্তা করতে করতে একটা অপার্থিব শিহরণ বয়ে গেল ভগীরথের সমস্ত শরীরে।

দু'হাতে মঙ্গলশঙ্খ মুখের উপর চেপে ধরে ভগীরথ মুহুর্মুহু ফুঁ দিতে লাগলেন। অবশেষে সগর-সন্তানদের ভস্মীভূত দেহাবশেষ সহসা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল পতিতপাবনী গঙ্গার স্পর্শে। কল্লোলিনী গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে এক দুন্দুভি রব শোনা গেল আকাশে বাতাসে। সহসা হিংসা ভুলে পাশাপাশি একসঙ্গে চলতে লাগল বনের পশুরা। পদ্মের মুকুল পাপড়ি মেলে জলের উপর লুটোপুটি করতে থাকল

সরোবরে। নীল আকাশের বুকে সারিবদ্ধভাবে উড়ে যেতে যেতে সুন্দর একটি মালা সৃষ্টি করে সেটিকে যেন ভগীরথের গলায় পরিয়ে দিল দূরের পাখিরা। জগতের সমস্ত প্রাণীরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল এক সঞ্জীবনী মন্ত্রে। পৃথিবী সহসা প্রাণচঞ্চল হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল।

দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এবং পুনরুজ্জীবিত সগর-সন্তানদের গঙ্গার উভয় তীরে বসবাস করার উপদেশ দিয়ে গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন ভগীরথ। কিছুদূর এগুতেই তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, একদল মাঝবয়সী রমণী মাথায় এবং কোমরে কলসী নিয়ে জলাশয় থেকে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে।

তাদের মধ্যে একজনকে প্রশ্ন করতেই সে বলল, বাবা, আমরা এখান থেকে অনেক অনেক দূরে থাকি যার নাম মরুভূমি। সেখানে শুধু বালি আর বালি। জলের নামগন্ধ নেই কোথাও। তাই ভোরবেলা উঠেই আমাদের জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হয় আর ছিটেফোঁটা জল নিয়ে ফিরি সেই সন্ধ্যেবেলা।

—বল কী! এত কষ্ট করে তোমাদের জীবন ধারণ করতে হয়! তা এতদিন তোমরা কোত্থেকে জল নিতে?

—আজ্ঞে! ডোবা-ঝিল-পুকুর যেখানে পথে জল মেলে সেখান থেকেই জল নিই।

—তোমরা খাও কী? তোমাদের আবাদ মানে চাষবাস কী করে হয়?

—বাবা, মাঝে মাঝে যেখানে জলাশয় আছে, তার পাশেই আমাদের মরদরা জোয়ার ভুট্টা চাষ করে। কোনো রকমে আধপেটা খেয়ে বেঁচেবর্তে আছি।

—তোমরা কিছু ভেবো না। এখন থেকে সবাই চাষ-আবাদ করার জল পাবে, পেট পুরে খেতে পারবে।

—বলেন কী, বাবা! আমাদের দেশ মরুভূমিতেও জল পাবো! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান!

সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথ পেলব মুখর গঙ্গার দেহকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে কখনো অর্দ্ধ বৃত্তাকারে কখনো সিকি বৃত্তাকারে বইয়ে নিয়ে চললেন আর তার দুই বাহু থেকে শাখানদী ও উপনদী বের করে মিলন ঘটিয়ে দিলেন মূল স্রোতের সঙ্গে। শুধু তাই নয় গঙ্গার হাতের এবং পায়ের আঙুল খাল-নালা ইত্যাদিতে পরিণত করে সেই শাখানদী ও উপনদীর সঙ্গে যোগ করে জলের ব্যবস্থা করলেন উষর মরুর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত কিছু কিছু সগর-সন্তানদের পাঠালেন দূর দূর মরুপ্রান্তে সেইসব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে।

তারপর ভগীরথ মহানন্দে তার শঙ্খ ফুঁকতে ফুঁকতে বিশালকায়া গঙ্গাকে নিয়ে চললেন মোহনার দিকে। মোহনায় পৌঁছতেই গঙ্গার দেহ আবার বহুধায় বিভক্ত হয়ে মহাসমুদ্রের বুকে লীন হয়ে গেল। পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্য স্পর্শে মহাসমুদ্রের জলজ প্রাণীরা সহসা উদ্বেল হয়ে উঠল। নাসারন্ধ্রে জলের ফোয়ারা বের করতে করতে তিমি সেই বিজয়-বার্তা পৌঁছে দিল মহাসমুদ্রের কোণে কোণে। পেছনে পুচ্ছের সাহায্যে ভারসাম্য রেখে কত রকমের মাছ আনন্দে তাদের পাখনা মেলে এদিক ওদিক সাঁতার কাটতে লাগল। নানা ধরনের রঙিন মাছ শরীরের নানা অংশ আকিয়ে বাঁকিয়ে মহানন্দে নাচ শুরু করে দিল প্রবাল দ্বীপের গলি-ঘুপচিতে।

জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পূর্ণতা লাভ করায় হৃষ্টচিত্ত ভগীরথ সাগর-সঙ্গমে পুণ্যস্নান করলেন। তারপর মোহনার ব-দ্বীপ অঞ্চলে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে ধ্যানে বসে পড়লেন তিনি। দীর্ঘদিন পর পুনরায় তিনি যাত্রা করলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে।

যেতে যেতে মাঝপথে তিনি লক্ষ্য করলেন সমতল ক্ষেত্রে গঙ্গার স্ফীতকায় বুকে কারা যেন বিহার করছে একটা ময়ূরপঙ্খী নৌকায়। দূর থেকে সুরেলা গানের কলি, মৃদঙ্গের বোল আর নূপুরের ধ্বনি তার

কানে ভেসে এল। তিনি দেখলেন সেই রঙবেরঙের নৌকার মাঝখানে মখমলের মতো আসনের উপর বসে মদের ফোয়ারা বইয়ে দিচ্ছে একজন স্থূলদেহী। আর পাশে বসা একদল সভাসদ কেনা জো-হুজুরের মতো শুধু মাথা নাড়ছে। চাঁদোয়া টাঙানো সেই মজলিসের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন দ্বাররক্ষী।

ভগীরথ পুনরায় লক্ষ্য করলেন নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে সামনে পিছনে ছজন করে বারো জন লোক ডুলি কাঁধে কাকে যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো মানুষজন ভয়ে তাদের রাস্তা করে দিচ্ছে সামনে এগিয়ে যেতে। আর তার আগে পিছে বর্শাধারী রক্ষীদল। ভগীরথ কাছে গিয়ে একজনকে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, ওই ডুলির ভিতর ওরা কাকে নিয়ে যাচ্ছে?

—আজ্ঞে! স্বয়ং ভূস্বামী যাচ্ছেন, বাবাজী! দেখছেন না—সামনে পিছনে রক্ষী আর সবার পেছমে বর্শাধারী ঘোড়সওয়ার?

—আর নদীর উপর ময়ূরপঙ্খী নৌকোয় ওরা সব করা?

—আজ্ঞে! ওরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠী—দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভূস্বামী তো এদের কথায়ই ওঠবোস করেন।

—ওরা কোনো কাজকর্ম করে না?

—বাবাজী, আপনার মাথাটা একেবারে গেছে! বলি ভূস্বামী শ্রেষ্ঠীরা কোনদিন কাজ করে?

—তা নৌকোর ভেতর ওরা কী করছে?

—নৌকোর ভিতর? নৌকোর ভিতর চলছে বিলাসবিহার। ঐ যে বেহাগ রাগে করুণ সুরে গান ভেসে আসছে—শুনেছি মরুদেশ থেকে এক অপরূপ বেদুইন নারীকে জোর করে ধরে এনে শ্রেষ্ঠী তাকে দাসী করেছে। আর মিহি সুরে বাগেশ্রীতে যে নারী গান গাইছিল— সেই হতভাগীকে পাহাড়ের এক দুর্গম স্থান থেকে এনে বানিয়েছে বাঁদী।

এইসব দেখেশুনে ব্যথায় ভরে উঠল ভগীরথের মন। উদ্ধারপ্রাপ্ত ষাট হাজার সগরসন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবেও তার মন বিচলিত হয়ে

পড়ল। তাদের উপর যদি সেই পাহাড়িয়া কিম্বা বেদুইন নারীদের মতো অত্যাচার হয়—এই কথা মনে আসতেই তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। কঠোর তপস্যায় দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করে গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার কি এই পরিণাম।

বিচলিত মন নিয়ে ভগীরথ পুনরায় ফিরে চললেন কৈলাস পর্বতে। দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করে তিনি তার অভিযোগ জানালেন, প্রভু, মর্ত্যে একী অনাচার! সেখানকার ভূস্বামী আর শ্রেষ্ঠীরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি দিন যাপন করছে। নিজেরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বিলাসব্যসনে মত্ত। দূর দূর প্রান্ত থেকে অসহায় নারীদের জোর করে ধরে এনে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে, প্রভু।

নন্দি-ভৃঙ্গির দেওয়া ভাঙের নেশায় বিভোর মহাদেব ঢুলু ঢুলু চোখে একটু মুচকি হেসে বললেন, তাই বুঝি! তা আর কি করবে বল—স্বর্গের নিয়ম স্বর্গে আর মর্ত্যের নিয়ম মর্ত্যে।

—কিন্তু এর কোনো বিহিত নেই? এর কোনো বিচার নেই?

—বিহিত? বিচার? দিনকাল সব পাল্টে গেছে, ভগীরথ!

—বলছেন কি ভগবন? আপনি তো ইচ্ছে করলে পৃথিবীকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারেন! তাছাড়া আপনি নিজেই তো আমাকে বলেছিলেন বিশ্বের মুক্তির কথা!

—.স-ক্ষমতা এখন আর নেই আমার, ভগীরথ। তুমি বরং পাতালপুরীতে গিয়ে স্বয়ং কপিলমুনির সঙ্গে একবার দেখা কর।

নিরাশ অন্তরে ভগীরথ কৈলাস পর্বত থেকে পাতালপুরীতে কপিল মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মুনিকে প্রণাম করে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন তার কাছে। সব জেনেশুনে কপিলমুনি বললেন, ভগীরথ, রাগের মাথায় তোমার বংশের ষাট হাজার সন্তানকে ভস্মীভূত করে আমি পরে সত্যি সত্যি বিবেকের দংশন অনুভব করেছি। শাস্ত্রে আছে—লঘু পাপে গুরু দণ্ড। আর সেই অপরাধে আমি নিজেকে আজও অপরাধী মনে করি। শুধু তাই নয় ষাট হাজার অবোধ

ছেলেদের হত্যা করে আমি এক মহাপাপ করেছি।

—মুনিবর, আমার অগ্রজ পুরুষগণ যে অপরাধ করেছিল, আপনি তাদের যোগ্য শাস্তিই দিয়েছিলেন। কিন্তু মর্ত্যে এই যে দিনের পর দিন মহাপাপ চলছে—দয়া করে আপনি তার একটা বিহিত করুন, বিচার করুন, তাদের চরম শাস্তি দিন, মুনিবর।

—সে শক্তি আমার নেই, ভগীরথ।

—কী বলছেন মুনিবর? যার এক প্রখর দৃষ্টিতে ষাট হাজার মানুষ মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায় তিনি আজ……

—ভগীরথ, আজ আমি শক্তিহীন, অসহায়, একক, অক্ষম……

বিস্মিত বিমূঢ় ভগীরথ কপিলমুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দৃঢ় পদে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। স্বর্গের কল্পনাবিহীন বিলাস-বৈভব, মর্ত্যের অসহায় মানুষের আর্ত হাহাকার ও পাতালের গাঢ় নীল কুজ্ঝটিকা সমস্তই ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। কপিলমুনির দুটি কথা 'একক অক্ষম' উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল বারবার তার মনে। শেষে পাতালের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চললেন ভগীরথ মর্ত্যের পথের দিকে।

যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন পর্বত শিখর থেকে একটা ঝর্ণাধারা ক্ষিপ্র গতিতে সবেগে নেমে আসছে সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে। উদ্দাম উচ্চণ্ড সেই জলধারা। তার দাপটে সবাই তটস্থ। গুল্ম-লতা-পাতা থেকে শুরু করে ছোট-বড় গাছ পর্যন্ত সবই ধরাশায়ী। কিন্তু পাহাড়ের সানুদেশ থেকে সগর্বে মাথা তোলা একটা নাছোড়বান্দা পাহাড়ী গাছ কিছুতেই সেই ঝর্ণার নিকট নতি স্বীকার করেনি। খরস্রোতে ক্ষণিক দমিত হয়েও বারবার মাথা উঁচু করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে সেই ছোট্ট গাছটি। কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করতে সে শেখেনি। ছোট্ট সেই পাহাড়ী গাছটির অদম্য শক্তির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ভগীরথ এগিয়ে চললেন উদ্ধারপ্রাপ্ত ষাট হাজার সগর-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যের সেই মহাপাপের মুখোমুখি হতে।

মুক্তির সন্ধানে

সোমরা—ইয়ে—সোমরা, তুহার শহরবাবুরা আসবেক লাই—হাঁকডাকে সোমরার মা কথাটা সোমরাকে জানিয়ে দিল।

হাঁকডাক করার অবশ্য একটা গরজ ছিল। কারণ সোমরা তার মাকে বলেছিল যে, কলকাতা থেকে শহুরে বাবুরা আসবে এই সাঁওতাল বস্তিতে। নির্দিষ্ট সময়ের ট্রেন চলে যেতেই সোমরার মা সোমরাকে সেই কথা মনে করিয়ে দিল।

শূয়রের ঘর থেকে শূয়রের বাচ্চাগুলো বার করতে করতে সোমরা উত্তর দিল, আসবেক, মাই, আসবেক। কথা যখন দিয়াছে, তখন বাবুরা হাচাই আসবেক। এই বলে শূয়রের বাচ্চাগুলোর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল, হেই ইধার চল্, হেই উধার চল্। মাথায় বুইদ্ধি লাই কেনে?

পাশের ধান ক্ষেতের আল ধরে চাঁই কাঁধে যাচ্ছিল বিরহুয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে সোমরার মা বলল, ইয়ে বিরহুয়া, ইস্টিশান থিক্যা আইলি বট্টে! কোনো শহরবাবুকে দেইখ্‌লি?

কাঁধের চাঁইটা মাটিতে নামিয়ে বিরহুয়া উত্তরে বলল, নাই, মাই, ভিনদেশী কাহাকে দেখি নাই বট্টে।

খোঁয়াড় থেকে সোমরা বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠল, আরে মাই, তুই থাম্ বট্টে। আমি ইতুয়াকে পাঠাইছি ইস্টিশান—ও আসবেক 'খন।

লেখাপড়া জানা সোমরার কথা শুনে মা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, মাথায় বুইদ্ধি বট্টে! সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত আশাবাদী হয়ে গর্বে তার বুকখানা ভরে উঠল।

রাজগ্রাম স্টেশন থেকে ক্রোশ দুই গেলেই মালকোলা সাঁওতাল

পল্লী। অনুচ্চ পাহাড় ঘেরা গ্রামখানিকে প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির শিশু বলে মনে হয়। সারিবদ্ধ শাল, সেগুন, পলাশ, মহুয়া শোভিত প্রাকৃতিক পরিবেশ বড়ই মনোরম। মাটির দেয়াল ঘেরা শণের ছাউনি দেয়া বাড়িতে দারিদ্র্যের চিহ্ন চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যায়। রাত্রি নেমে এলে মহুয়া ফুলের গন্ধে আর রূপালী চাঁদের মায়ায় এক বিধুর আবেশ সৃষ্টি হয়। তখন ধিতান ধিতান বোল ভেসে ওঠে সাঁওতাল পল্লীর কোণে কোণে।

প্রকৃতির কোলে লালিত শিশুদের নামকরণও করা হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। সোমবারে জন্মালে সোমরা, মঙ্গলবারে মঙ্গলা, বুধবারে বুধুয়া, বৃহস্পতিবারে বিরছুয়া, শুক্রবারে শুকরা, শনিবারে শনিয়া আর রোববারে ইতোয়া। নামকরণের এমন সহজাত নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এদিকে সেই শহুরে বাবুরা বোলপুরে নেমে পথিমধ্যে শান্তিনিকেতন দেখার মনস্থ করল। তিন বন্ধুর মধ্যে দাশু রায়ের উপর পার্টির নির্দেশ ছিল সাঁওতাল পরগণায় জনমত গঠন করার। অপর দুজনের মধ্যে একজন প্রদীপ চ্যাটার্জী এবং আর একজন সন্তু বসু। প্রদীপকে তার বন্ধুরা ডাকে দীপ বলে।

দাশু : দীপ, কাজটা তোরা ভাল করলি না। ওদের কথা দেওয়া আছে আমরা যাবো।

দীপ : আরে রাখ্ তোর কথা দেয়া! দুদিন পরে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। তাছাড়া—আচ্ছা সন্তু তুইই বল—বোলপুরের উপর দিয়ে যাবো অথচ গুরুদেবের বিশ্বভারতী দেখবো না—এ কখনো হয়?

সন্তু : বিলক্ষণ! আমি তো ভাবছি রামপুরহাট নেমে একেবারে তারাপীঠ দর্শন করে যাবো। ওখানে শুনেছি সাধুরা শবসাধনা করে মরার উপর বসে।

দীপ : বলিস কি! তাই নাকি?

সন্তু : শুধু তাই নয়! তারাপীঠে সবার সামনে লাল শাড়িপরা যে-মূর্তি রাখা আছে সেটা আসল মূর্তি নয়। আসল মূর্তিটি রয়েছে তারামূর্তির নিচে।

দাশু : তার মানে! তোকে কে বললে?

সন্তু : আরে শোন্ না যা বলছি। আসল মূর্তিটা তারামূর্তি নয়—সেটা হচ্ছে দুর্গামূর্তি। সমুদ্রমন্থনের সময় বিষ পান করে শিব অক্কা পেলে নারদের কথা মতো দুগ্‌গা নিজের মাই খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। এটা হচ্ছে একেবারে সেই মূর্তি।

দীপ : বলিস কি! তাহলে তো যেতেই হয়।

সন্তু : কিন্তু অন্ধকার ঘরে পুরুতকে ষোল আনা না দিলে ও-মূর্তি দেখতে দেয় না।

দীপ : ষোল আনা কি রে! এমন দৃশ্য দেখার জন্য আমি ষোল দুগুণে বত্রিশ আনা খরচ করতেও রাজি! এরকম একটা অভিজ্ঞতা কখনো হাতছাড়া করতে আছে? শালা, দেবাদিদেব মহাদেব দেখছি আমার চেয়েও খচ্চর ছিল!

দাশু : দীপ, শোন্। তোদের এসব প্ল্যান বাদ দে। নইলে অধীরদা আমাদের একেবারে তুলোধুনো করে ছাড়বে।

দীপ : আরে রাখ্ তোর অধীরদা! ধীর স্থির নয় বলেই না ওর নাম হয়েছে অধীর। রাতদিন খালি পার্টি—পার্টি—আর পার্টি!

শান্তিনিকেতন ও তারাপীঠ দেখে তিন বন্ধু নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন পরে গিয়ে হাজির হল সাঁওতাল পল্লীতে। স্টেশনে পৌঁছেই তারা এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ভাবখানা এই যে নিশ্চয়ই তিন দিন তিন রাত্রি না খেয়ে না দেয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে মূর্খ সেই আদিবাসীগুলো। যাহোক কলকাতা শহরের মতো সাঁওতাল পল্লী এমন নয় যে পাশের ঘরে কে বাস করছে তার খবর পাশের বাড়ির লোকই রাখে না। পল্লী জীবনের জীবনধারা নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। তাই সোমরা মুর্মুর নাম করতেই বাবুদের সবাই সেই বাড়ি

দেখিয়ে দিল।

কলকাতা থেকে আসা বাবুদের দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেল সোমরা ও তার মা। উঠোনে খেজুর পাতার তৈরি মাদুরের উপর বসিয়ে শহুরে অতিথিদের তালপাতার পাখায় তারা বাতাস করতে লাগল। সসব্যস্ত হয়ে মাকে সোমরা বলল, মাই, পাতায় করে মুড়ি আর তালগুড় বাবুদের দিইবিক লাই ? এই কথা বলে মাকে সাহায্য করার জন্য মাটির দেয়াল ঘেরা এবং শণের ছাউনি আঁটা ছোট্ট ঘরে মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল সোমরা।

সোমরার কথা কানে যেতেই প্রদীপ খেঁকিয়ে উঠল, দাশু, বোলপুর রামপুরহাটে কব্জি ডুবিয়ে মাংসভাত খাবার পর এখানে এসে শেষে শুকনো মুড়ি চিবুতে হবে নাকি ? আমার ও-সব পোষাবে না বলে দিচ্ছি !

দাশু নিচু গলায় বলল, কী হচ্ছে দীপ, এরা গরীব মানুষ। এটা কি শহুরে রেস্তোরা পেয়েছিস ? যা দিচ্ছে চুপচাপ তাই খাবি।

সোমরার মা পদ্মপাতায় তালগুড় আর মুড়ি এনে তিনজনকে দিয়ে ফোঁকলা দাঁতে অনাবিল হাসির রেখা টেনে বলল, তুরা কথামোতো আসলি না কেনে ? অসুবিধা হয়েছিল বট্টে !

সন্তু বলল, মাইজি, আমরা একটা জরুরী কাজে আটকে গিয়েছিলাম ; তাই সেদিন আসতে পারিনি।

সোমরার মা বলল, অ—তাই বট্টে ! আচ্ছা তুরা বসে বসে খেতে লাগ্। হামি ওদিক পানে দেখে আসি। আরে তুদের লাগি কিছু করতে হোবে বট্টে ?

কাঁধে খ্যাবলা জাল দিয়ে মাথা নিচু করে সোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের একফালি রাস্তা দিয়ে যেতে উদ্যত হতেই সন্তু তাকে ডেকে বলল, সোমরা, সোমরা ভাই, তুমি কোথা যাচ্ছ ?

সোমরা বলল, আপনাদের লাইগ্য মাছ ধরে নিয়ে আসি বট্টে। মুদের পাশেই পুকুর আছে।

কথা শুনে প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গে জাল-কাঁধে সোমরার পিছু নিল। খানিক যেতেই তালগাছ টুকরো টুকরো করা গুঁড়ি দিয়ে তৈরি পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে সোমরা তরতর করে নেমে গেল পুকুরের মধ্যে। পুকুরে নেমেই কোমর জলে দাঁড়িয়ে তুহাতের কায়দায় খ্যাবলা জাল তার মাথার উপর একপাক ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে ছুঁড়ে দিল খানিক দূরে প্রায় মাঝ পুকুর অবধি। তারপর সেই জালের দড়ি আস্তে আস্তে টেনে তুলতেই মাঝারি ধরনের একটা রুই, একটা কাতলা এবং অন্যান্য চুনো মাছ ধরে পুরে নিল পেছনে বাঁধা তার নিজের খালুইয়ে।

প্রদীপ বলল, সোমরা, তোমার জালটা দাও তো আমাকে, আমিও মাছ ধরবো।

এই কথা শুনে সন্তু তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, দেখ্ দীপ, মাছ ধরা অতো সহজ ব্যাপার নয়। তুই শহরের ছেলে—সাঁতার জানিস না—কোনো বিপদ-আপদ হতে পারে।

প্রদীপ বলল, আরে তুই থাম্! চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখ্ শুধু আমি কি করি।

অগত্যা সোমরা তার পিঠে ঝোলানো জাল বাবুর দিকে এগিয়ে দিল। বাবুটিও কোমর জলে নেমে সোমরাকে নকল করে যেই খ্যাবলা জাল ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে, অমনি সেটা তারই মাথার উপর গুটিসুটি হয়ে পড়ে গেল এবং তাল সামলাতে না পেরে জালসুদ্ধ জলের মধ্যে পড়ে খাবি খেতে লাগল শহুরে বাবু প্রদীপ। ভাগ্যিস সোমরা কাছেই ছিল; তাই সঙ্গে সঙ্গে পাঁজা কোলে করে ডাঙ্গায় তুলে নিল তাকে। নাকানি-চোবানি খেয়ে বাছাধন ডাঙায় উঠেই হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করতে শুরু করে দিল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ডাঙায় দাঁড়ানো সন্তু বলে উঠল, পই পই করে বললাম—মাছ-ধরা তোর কম্ম নয়! এখন হল তো? সাঁতার না শিখে মাছ ধরতে গেলে ওরকমই জালে জড়িয়ে পড়তে হয়—বুঝেছিস? গাড়ু কোথাকার!

সোমরা বলল, অমন করে বলবেননি গো, বাবু! বাবু বড়ই নাকাল হইছেন, বাবু!

পরদিন সাঁওতাল পল্লীতে সভা বসল ইতোয়া মুর্মু'র বাড়িতে। জনাকয় লোক উপস্থিত হয়ে তাই দেখছিল। এতোয়ার ছেলে বুধুয়া মুর্মু সাইথিয়া মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর কিছুদিন কেন্দ্র-সরকারী কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সাঁওতালদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবে সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে বীরসা মুণ্ডার আদর্শে নিজের স্বজাতির মঙ্গলের কথাই সে এখন রাতদিন চিন্তা করে। কারণ সে দেখেছে যে, আদিবাসীদের দুঃখে গদগদ হয়ে তাদের মুক্তির আশ্বাস দিতে এগিয়ে এসেছে অনেকেই। কিন্তু অচিরেই তাদের মুখোস খসে পড়েছে দিনের আলোর মতো।

দাশু রায় প্রথমে সকলকে সম্ভাষণ করে সভার কাজ শুরু করল, বন্ধুগণ, আপনারা আদিবাসী—ভারতের গর্ব। কিন্তু আপনাদের দুর্দশার কথা চিন্তা করলে আমাদের লজ্জা হয়—আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। আপনারা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে আছেন—শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, চিকিৎসা, বাসস্থান......কী নয়...। আমাদের পার্টি আপনাদের এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে চিরমুক্তি দিতে চায়।

দাশুবাবুর গলা বাঁধ ভাঙা নদীর মতো অনর্গল ধারায় বয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তায় একটা নেড়ি কুত্তার ঘেউ ঘেউ শব্দে তাকে তার বক্তব্যের মধ্যে ইতি টানতে হল। প্রাণের আশ মিটিয়ে বক্তব্য রাখতে না পারায় বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল তার প্রসস্ত কপালে। তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে কুকুরটাকে তাড়াতে এগিয়ে গেল ইতোয়া। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সাঁওতাল পল্লীর ভিতর অপরিচিত লোকের অপরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলা দেখে অনর্গল ঘেউ ঘেউ করতে লাগল সেই রাস্তার কুকুর।

এমন সময় শনিয়ার মা লখিয়া সেখানে এসে হাজির। সে হাতের চিঠিটা বুধুয়ার দিকে বাড়িয়ে বলল, ইয়ে বুধুয়া, এ চিঠিখানা পড়িয়ে

দিবি বট্রে! হামার বহিন লিখ্যেইছে কোরাপুট থেইক্যে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বুধুয়া দাশু রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা আমাদের দুর্দশার কথা বলছিলেন না? এই দেখুন, এর বোন থাকে ওড়িষ্যার কোরাপুটে। সেখানে ওর ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে ওড়িয়া হরফে। আর আমরা এখানে লেখাপড়া শিখি বাংলা হরফে। আমার পকেটে আরো দুখানা চিঠি আছে—আমাদের এই পল্লীরই আত্মীয়স্বজন—যার একজন থাকে বিহারের সাহেবগঞ্জে এবং আর একজন মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড়ে। সেখানে তাদের হিন্দি ও উর্দু হরফে লেখাপড়া করতে হয়।

দাশু: কেন যার যার মাতৃভাষায় লেখাপড়া করলেই হয়। আমাদের পার্টি তাই বলে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধবৎ।

দীপ: আহা কী কথা! শুনেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এর কোনো জবাব আছে!

বুধু: সেই কথা কে বলে বলুন? আমাদের আদিবাসীদের কেউ শিখবে বাংলা, কেউ ওড়িয়া, কেউ হিন্দি আর কেউবা উর্দু। আপনারা হরিনাথ দের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন।

তিন বন্ধু: হরিনাথ দে! সে আবার কে?

বুধু: সেকি—আপনারা দে সাহেবের নাম জানেন না! যিনি তিরিশটা ভাষায় এম. এ পাশ করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। আমাদের আদিবাসীদেরও এক একজনকে সেই হরিনাথ দের মতো হবে হতে হবে; নয়তো সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ!

সন্তু: সুনীতিদা! তার মতো পণ্ডিত কজন হয় বল?

দাশু: উনি তো আমাদের পার্টির সদস্য ছিলেন।

বুধু: কিন্তু যতদূর জানি তিনি কোনো রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

দীপ: ডাইরেক্টলি নন, তবে ইনডাইরেক্টলি বটে।

বুধু: আচ্ছা আপনারা তাঁর ও. ডি. বি. এল পড়েছেন?

দাশু: ও. ডি. বি. এল! এরকম বই-এর নাম তো কোনোদিন শুনিনি। এই সন্তু, এই দীপ, তোরা শুনেছিস?

সন্তু: না···এরকম তো কোনো···

বুধু: সে কি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা ভাষার উৎস ও বিকাশ'—এই বইয়ের নাম শোনেননি? যে বই লিখে তিনি এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ হন!

এইসব কথা শুনে দাশু, সন্তু এবং প্রদীপ সবার মুখই চুন হয়ে গেল। প্রদীপ তো সন্তুর কানে কানে বলেই ফেলল, বাঞ্চতটা অনেক কিছুই জানে দেখছি। এই টেরিসার সাঙ্গপাঙ্গরাই এদের মগজ ধুলাই করেছে। তারপর বুধুয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যেই বলল, হ্যা, তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা এখানে এসেছি আমাদের পার্টির বক্তব্য রাখতে—আদিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার উৎস খুঁজতে এবং তার নিরসন করতে। তুমি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে আমাদের বিভ্রান্ত করছো কেন?

বুধু: অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই আমি এসব বলছি। আচ্ছা আপনারা আমাদের রঘুনাথ মুর্মুর নাম শুনেছেন?

দাশু: রঘুনাথ মুর্মু! সিডা কিডা?

বুধু: কথাটা ভদ্রভাবে বলুন—বলুন, তিনি কে। রঘুনাথ মুর্মুর নাম যখন জানেন না, তখন 'অলচিকি' কথাটার নামও নিশ্চয়ই আপনারা শোনেননি। 'অলচিকি' হরফ আবিষ্কার করে রঘুনাথ মুর্মু আমাদের আদিবাসীদের ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছেন—আপনাদের ক্ষেত্রে যেমন চর্যাপদ।

দীপ: চর্যাপদ! আমাদের বাংলা ভাষায় তো এরকম কোনো পদ নেই! পদ তো জানি পাঁচ প্রকারের—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

বুধু: এ-পদ সে-পদ নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম শোনেন নি?

দীপ : লালবাহাদুর শাস্ত্রী তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। হরপ্রসাদ আবার কে ? ও শাস্ত্রী মশাই ? যিনি হাত-টাত দেখেন।

বুধু : আজ্ঞে না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করে বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন—যেমন আমাদের রঘুনাথ মুর্মু আদিবাসী-দের ক্ষেত্রে করেছেন।

দাশু : সেটা না হয় বুঝলুম। কিন্তু এতো সব কথা বলার মানে কী ? তুমি কী বলতে চাও ?

বুধু : আচ্ছা ধরুন আপনাদের তিন তিনজন নিকট আত্মীয়—একজন বিহার, একজন ওড়িষ্যা আর একজন মধ্যপ্রদেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় চিঠি দিল। আপনারা বুঝতে পারবেন সেই চিঠির মর্মার্থ ? কী চুপ করে রইলেন কেন ? বলুন ? জবাব দিন ?

বুধুয়া মুর্মুর কথায় তিনজনই মাথা নিচু করে রইল। বাবুদের অস্বস্তিকর অবস্থা দেখে সোমরা বলে উঠল, বুধুয়া, তু বড় বেশি কথা কইছিস কেনে ? বাবুদের সবার সামনে বলতে দিইবিক লাই ?

কলকাতা বাবুদের মুখে কোনো কথা নেই দেখে বুধুয়া বলতে লাগল, আপনারা আমাদের দুর্দশার কথা শুনতে এসেছেন তাই না ? এই হল আমাদের দুর্দশার গোড়ার কথা! পৃথিবীতে এই ধরনের শোষণ এই রকম বঞ্চনা কোথাও দেখাতে পারেন ? দাসযুগেও এই ধরনের নিপীড়ন ছিল না।

সন্তু : তা হলে তোমাদের হরফ অলচিকি চালু করলেই তো সব মিটে যায়।

বুধু : কিন্তু কে করে বলুন ? চার চারটে রাজ্যের ব্যাপার। শুধু প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি।

দাশু রায় দেখল অধীরদা যতটা সহজ মনে করেছিলেন, সাঁওতাল পল্লী অত নরম মাটি নয় যে যখন যেমন খুশি ছক কেটে দেয়া যায়। সভা শেষ হলে মনে মনে তাই সে বিড়বিড় করতে লাগল, মিশনারীরা এদের মাথাটা খেয়েছে। শালারা আজকাল অনেক কিছুই জেনে

ফেলেছে। শালা আমাদের একেবারে নাকানি চোবানি খাইয়ে দিলে। সাঁওতাল পল্লী না হয়ে হত আমাদের এলাকা, দিতুম শালা দু-চারটে পেটো ঝেড়ে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

পরদিন আর এক সাঁওতাল পল্লী গণপুরে সভার কাজ ধার্য করে তিন বন্ধু মাথা হেঁট করে ফিরল আপন ডেরায়। আসতে আসতে সন্তু বলল, দাশু তুই কী ভাবছিস জানি না; তবে বুধুয়ার কথায় যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

দাশু: রাখ্ তোর যুক্তি।

দীপ: তবে ব্যাটা অনেক কিছুই জানে। ও. ডি. বি. এল, অলচিকি কী সব নাম—বাপের জন্মে শুনিনি। আচ্ছা সন্তু, তুই তো পড়াশুনো করিস। এসব নাম কখনো শুনেছিস?

সন্তু: নারে, ঠিক মনে পড়ছে না।

দীপ: শালা নিগ্রোর বাচ্চারা আমাদের নাকে একেবারে ঝামা ঘষে দিল।

সন্তু: দেখ্, কালকে আবার আমাদের কপালে কী আছে। শুনেছি গণপুর ওদের আরও শক্ত ঘাঁটি।

দীপ: রাখ্ তোর শক্ত ঘাঁটি। শালা আমাদের পাড়া হলে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতুম। ছোটলোকদের বেশি লাই দিতে নেই, বুঝলি?

কথা মতো পরের দিন সভার আয়োজন করা হল গণপুরে। মল্লারপুর স্টেশন থেকে গণপুর যাবার দৃশ্য বড় মনোরম। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ শাল সেগুনের ঘন বন। মাঝে মাঝে শিমুল পলাশ ফুল ফুটে পরিবেশকে উৎফুল্ল করে তুলেছে। দূরে সারি সারি মহুয়া ফুলের কাছেই শাল গাছের ডালে মৌমাছিরা মৌচাক গড়েছে। সারিবদ্ধ সাঁওতাল রমণীরা সারিবদ্ধভাবে যে যার কাজে চলেছে ঠিক শাল-সেগুনের মতো। কুচকুচে কালো দেহ; কিন্তু সুঠাম গঠন, নিটোল গড়ন। সবুজ-হলুদ পাড় সাদা রঙের শাড়িতে তাদের বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে।

সভা বসেছে বাগরাই সোরেণের বাড়ি। যথারীতি বাবুদের সেখানে নিয়ে গিয়েছে সোমরাই। চারিদিকে খড়ের ছাউনি দেয়া সারি সারি মাটির বাড়ির মধ্যে এই বাড়িখানায় শুধু টিনের চাল। বাগরাই সোরেণের ছেলে মিঠুয়া সোরেণ বিহার থেকে আগত অমূল্য মাহাতোকে নিয়ে সেই আলোচনা সভায় উপস্থিত। দাশু রায় কলের গানের মতো অধীরবাবুর শেখানো বুলি যথারীতি আউড়ে গেল। একই কথা বার বার শুনতে শুনতে প্রদীপ এবং সন্তুর বিরক্তি ধরে গেছে। তাই তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল সেই অস্বস্তির চিহ্ন। তবে দাশু এইখানে কতগুলি অতিরিক্ত কথা বলে তার বক্তব্য শেষ করল—আপনাদের খাওয়া জোটে না, পরা জোটে না, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, রোগের ওষুধ নেই···আপনারা···

মিঠুয়া : কথাগুলো একটাও ঠিক নয়। ভগবান আমাদের দুটো হাত দিয়েছেন—আমরা কি পুরুষ কি মহিলা সবাই কাজ করি। তাই আমাদের সকলের মুখে খাওয়া জোটে, পরনে কাপড় থাকে এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই মেলে। সেই জন্য আদিবাসীদের মধ্যে কোনো ভিখিরী দেখতে পাবেন না। পশুপাখি পর্যন্ত যখন মুখের আহার, থাকার জায়গা জোগাড় করতে পারে, তখন মানুষ হয়ে আমরা সেটা করতে পারবো না!

সন্তু : না না, উনি তা বলেননি। উনি বলেছেন বাঁচার মতো বাঁচার কথা—মানুষের মতো বাঁচা। আর সেই পথ দেখাতেই শহর থেকে আমরা পার্টির নির্দেশে এখানে এসেছি।

মিঠুয়া : সোমরার মুখে শুনলাম আপনারা শান্তিনিকেতন হয়ে আমাদের সাঁওতাল পল্লী এসেছেন। আচ্ছা সেখানে রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য দেখেছেন ?

দীপ : রামকিঙ্কর! সে আবার কে ?

মিঠুয়া : সেকি! বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন যাবার পথে রামকিঙ্করের তৈরি জ্ঞানভারে ন্যুব্জ রবীন্দ্রনাথের সেই পৃথিবী বিখ্যাত

মূর্তি দেখেননি ?

দীপ : (ব্যঙ্গভরে) পৃথিবী বিখ্যাত !

অমূল্য : আজ্ঞে হ্যা ! পৃথিবী বিখ্যাত। সেই মূর্তির আদল আছে লণ্ডনের সংগ্রহশালায়—এমনকি প্যারি শহরের কোনো এক চৌরাস্তার মোড়ে সেটা শোভা পাচ্ছে।

দাশু : সরি, ওটা আমরা মিস্ করেছি।

অমূল্য : আর তাঁর হাতে গড়া বাঁককাঁধে স্বামীর পিছন পিছন বাচ্চাসহ সাঁওতাল রমণীর দৃশ্য অথবা মড়ার খুলির ওপর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি কিম্বা বহুখ্যাত অনির্বাণ শিখা আপনারা শান্তিনিকেতনে নিশ্চয়ই দেখেছেন।

দীপ : (মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে) হ্যা ! তবে কলকাতায় ভালো। ভালো মূর্তি দেখার পর—যেমন রমেশ পালের গড়া বিধান রায়ের মূর্তি, মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি, অমুকের করা ক্ষুদিরামের মূর্তি...তমুকের করা...মানে...মানে...মানে...

মাঝ দরিয়ায় হাবুডুবু খাওয়া প্রদীপকে উদ্ধার করার জন্য শেষে দাশুই এগিয়ে এল। কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে সে অমূল্য মাহাতোর উদ্দেশ্যে বলল, মানে কলকাতা শহরে তো অসংখ্য মূর্তি। তাই সব মূর্তির খবর রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

অমূল্য অবাক বিস্ময়ে শুধু বলল, হ্যা, তবে আপনারা দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কোনো মূর্তি দেখেননি ? চেতলায়ই তো তাঁর ওয়ার্কশপ। সেখানে কখনো যাননি ?

দাশু : না, মানে—রাতদিন পার্টি করি তো—তাই সময় হয় না।

অমূল্য : পার্টি করেন বলেই তো তাঁকে জানা আরো বেশি দরকার। বিয়াল্লিশে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উপর তাঁর তৈরি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিখ্যাত প্যানেল, তাঁর শ্রমের বিজয় কিম্বা তাঁর মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি কে না জানে। দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্য দিল্লি, মাদ্রাজ, কলকাতা, পাটনা ভারতের সর্বত্রই তো রয়েছে।

দীপ : ও দেবুদা, তাই বলুন। উনিও তো আমাদের পার্টির সমর্থক ছিলেন।

অমূল্য : ছিলেন কি মশাই, উনি তো এখনো আছেন! এইতো বছর তিনেক আগে দেশের বন্যার উপর ছবি এঁকে তিনি বেশ আলোড়ন এনে ছিলেন।

হাতে-নাতে-ধরা-পড়ে এক-গাল-মাছি তিন বন্ধুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তিন জনই মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগল দাশু রায়। সোমরার অবস্থাটা অনেকটা ন যযৌ ন তস্থৌ-এর মতো। শেষে মিঠুয়া সোরেণ এই অস্বস্তিকর অবস্থার নিরসন করল। সে সন্তু বসুর উদ্দেশ্যে বলল, সন্তুবাবু, আপনারা বলছিলেন—বাঁচার মতো বাঁচার কথা!

দীপ : হ্যা, মানে মানুষের মতো বাঁচা!

মিঠুয়া : দেখুন, মানুষের মতো বাঁচা বলতে আমরা বুঝি আমাদের অস্তিত্বের কথা, আমাদের নিজস্ব সত্বার কথা, আমাদের নিজস্ব ভূমির কথা।

দাশু : (উত্তেজিত ভাবে) বিচ্ছিন্নতাবাদ আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ, পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ, আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদ, তামিলনাড়ুতে বিচ্ছিন্নতাবাদ—তারপর নাগাভূমি, মিজোভূমি, বোড়োভূমি সর্বত্র—ভারত টুকরো টুকরো হবে—আমরা কোনোমতেই তা হতে দিতে পারি না। ভারতের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব আমাদের যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ উস্কানি দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চাইছে—আমরা বুকের রক্ত দিয়ে তা রুখবো।

দাশুর এমন উদাত্ত ভাষণ প্রদীপ ও সন্তু আগে কখনো শোনেনি। তারা খানিকটা নড়েচড়ে বেশ শক্তপোক্ত হয়ে বসল—ভাবখানা এই যে, সারা ভারতের অখণ্ডতার গুরুদায়িত্ব এই মুহূর্তে যেন তাদের উপর ন্যস্ত।

প্রদীপ তো মনে মনে চেঁচিয়ে উঠল—ব্র্যাভো, দাশু, এটাই তো চাই। ব্যাটাদের বুঝিয়ে দে কত ধানে কত চাল!

অমূল্য : বিচ্ছিন্নতা—সাম্প্রদায়িকতা! আচ্ছা পৃথক অঙ্গরাজ্য গঠনের দাবি কি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নাকি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্ম হওয়া—কোনটা বোঝায় দাশুবাবু? তাছাড়া ভাষার ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্য গঠনের ব্যবস্থা তো ভারতীয় সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে।

দাশু : সে তো আমরা কবেই মিটিয়ে ফেলেছি।

অমূল্য : না, মিটিয়ে ফেলা হয়নি! বরং এখনো জিইয়ে রাখা হয়েছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পূতিগন্ধময় ছেঁড়া বুটে পা ঢুকিয়ে শুধু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন। নতুবা তথাকথিত ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের পরও আসামকে সাত টুকরো করা হয়নি? পাঞ্জাবকে তিন টুকরো করা হয়নি? বলুন?

দাশু : আপনি কী বলতে চান? স্পষ্ট করে বলুন।

অমূল্য : আমাদের কথা অতি সোজা। আমাদের উৎস রয়েছে—রয়েছে আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে—আছে আমাদের সংস্কৃতি। তাই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—এই স্বর্ণগর্ভ মাটির উপর—এইখানে চাই আমাদের নিজস্ব অঙ্গরাজ্য—চাই আমাদের প্রাণপ্রিয় ঝাড়খণ্ড—বিহার, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ আর কিছুটা পশ্চিমবাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে।

সন্তু : আমাদের সংবিধানে আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে—রয়েছে শতকরা সারে সাত ভাগ চাকরির সংরক্ষণ আর বিনামূল্যে লেখাপড়া ও উচ্চশিক্ষার অবাধ সুযোগ।

অমূল্য : আমাদের সংস্কৃতি! সাঁওতাল বৃন্দনৃত্য দেখে সাঁওতাল সংস্কৃতি পরিমাপ করা যায় না। তার ব্যাপকতা অনেক গভীরে—মারাংবুরু থেকে অলচিকি পর্যন্ত। একটা জাতিকে বোঝা অত সহজ নয়। আর সংরক্ষণ! সংবিধানে শতকরা সারে সাত ভাগ থাকলেও

সর্বভারতীয় পরিসংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও কম—সেটা জানেন কি ?

দীপ : (মনে মনে) শালারা জামাই আদরে চাকরি নেবে—আবার বড় বড় কথা! বলি ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। আর এদিকে আমরা সব বুড়ো আঙুল চুষছি। (প্রকাশ্যে) যাই হোক তবু তো আপনাদের কিছু হচ্ছে। তাই বলে ঝাড়খণ্ড সৃষ্টি করে আপনারা ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করবেন—যে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ক্ষুদিরামের মতো বিপ্লবীরা জীবন দিয়েছে।

অমূল্য : শুধু ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির দড়ি গলায় পরেননি—আমাদের বীরসা মুণ্ডাও দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন—জীবন দিয়েছে আমাদের প্রিয় সিধু-কানু।

সন্তু : কিন্তু ক্ষুদিরাম হচ্ছে ভারতের প্রথম শহীদ।

অমূল্য : মিথ্যে কথা। প্রথম শহীদ হচ্ছেন প্রফুল্ল চাকী।

সন্তু : কিন্তু আমরা জানি ক্ষুদিরাম।

অমূল্য : ইতিহাস ভুল কথা বলে। কিংসফোর্ডকে মারার উদ্দেশ্যে ভুল করে নিরীহ ব্যক্তির গাড়িতে বোমা ছোঁড়ার পর ক্ষুদিরামের সাথী প্রফুল্ল চাকী পুলিশের কাছে ধরা না দিয়ে নিজের গুলিতে প্রথম শহীদ হন। তারও আগে বীরসার আত্মাহুতি। আর বিপ্লবের কথা যদি বলেন তো বলি—বীরসাকে মুক্ত করতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মুণ্ডারা অংশ গ্রহণ করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন গণনেতৃত্বের রূপকার। আর ক্ষুদিরাম ব্যক্তি-সন্ত্রাসের প্রতিনিধি। আসলে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' এইসব আবেগপ্রবণ গান গেয়ে তাঁকে সবার সামনে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আর আপনারাও তাই লুফে নিয়ে তাঁর মূর্তি গড়েছেন, তাঁর নামে রাস্তাঘাট, স্কুলকলেজ এমনকি স্টেডিয়াম পর্যন্ত তৈরি করে দিয়েছেন!

দাশু : আপনারা বীরসাকে ক্ষুদিরামের চেয়ে বড় বিপ্লবী মনে করেন ?

অমূল্য : শুধু মনে করি না—এটা ইতিহাস সত্য।

দীপ : (মনে মনে) কথায় বলে—কোথায় রাণী ভবানী আর কোথায় পুস্তু রাঁধুনী। (প্রকাশ্যে) কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জানে ক্ষুদিরাম প্রথম বিপ্লবী।

অমূল্য : আগেই বলেছি ইতিহাস অনেক সময় মিথ্যে কথা বলে যেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুধরে নেওয়া উচিত। তাই প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য সেন, রাসবিহারী বসু, ভকৎ সিং এদের প্রতিকৃতি বিধান সভায় বা সংসদ ভবনে স্থান পায়, কিন্তু বীরসা মুণ্ডা, সিধু-কানু বা রঘুনাথ মুর্মু কোথাও ঠাঁই পায় না।

দাশু : সোমরার কথায়ই আমরা এখানে এসেছিলাম আপনাদের মঙ্গলের জন্য। এখন দেখছি···

মিঠুয়া : কিছু মনে করবেন না—সাদা পার্টি, লাল পার্টি আমরা অনেক দেখলাম। আসলে সবাই নিজেদের কাজে আমাদের ব্যবহার করতে চায়। শহরে এখন একটা নতুন কায়দা দেখা যাচ্ছে—কোন স্থানে কোন সেমিনার বা সিম্পোসিয়াম হলে আপনারা সাময়িকভাবে সেই জায়গার নামকরণ করেন বীরসা-নগর বা সিধু-কানু-ডহর ইত্যাদি। দু-চার ঘণ্টা পর বিশাল বিশাল ফেষ্টুন ও প্ল্যাকার্ড সরিয়ে নিলে সেই স্থান পুনরায় তার নিজস্ব নামেই থেকে যায়। আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। অবশ্য আপনারা অবচেতন মনেই সেটা করে থাকেন, কিন্তু আমাদের আদিবাসী জীবনধারার সঙ্গে সেটা কি সুন্দর মিলে যায়! শেষে সেক্সপিয়ারের সেই কথাটাই বলতে হয়—Suffering is the badge of our generation—কাজেই আমাদের মুক্তি আমাদেরকেই দেখতে হবে—অন্য কোনো পরগাছার উপর নির্ভর করে নয়।

সম্পূর্ণ বিফল হয়ে দাশু রায় আর তার দুই বন্ধু বাসে করে গণপুর থেকে ফিরছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে মালকোলা সাঁওতাল পল্লীর সোমরা মুর্মু এবং গণপুরের মিঠুয়া সোরেন। ফেরার পথে শিমুল পলাশ ফুলগুলি কি রকম যেন ফ্যাকাশে মনে হল দাশুর নিকট।

যাবার সময় যে মৌচাকটা দেখেছিল শাল গাছে, ফেরার পথে সেখানে একটা গুঞ্জন দেখতে পেল তারা। বাসের ভিতর বসে সন্তু বসু জয়বাংলার সময় তার কণ্ঠে উচ্চারিত একটি কবিতার লাইন মনে মনে আওড়াতে লাগল, বাংলার মাটি, দুর্জয় ঘাটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। পরক্ষণে সেই কবিতার লাইনটি তার অজান্তেই রূপান্তরিত হয়ে গেল, সাঁওতাল মাটি, দুর্জয় ঘাটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।

মল্লারপুর স্টেশনে পৌঁছেই প্ল্যাটফর্মের উপর শুধু পায়চারি করতে লাগল স্নায়ুচাপগ্রস্ত দাশু রায়। প্রদীপ তার পিছু পিছু গিয়ে সান্ত্বনার সুরে কিছু বলতেই দাশু একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, চুপ কর্! অধীরদার কাছে সে মুখ দেখাবে কি করে সেই কথা মনে পড়তেই দুশ্চিন্তার বলিরেখা তার সমস্ত মুখখানা একেবারে গ্রাস করে ফেলল।

উদাস দৃষ্টিতে সন্তু গণপুরের দিকে তাকাতে তাকাতে প্রদীপকে টিকিটের কথা বলতে সে খেঁকিয়ে উঠল, রাখ্ তোর টিকিট! পার্টির লোকের আবার…

সোমরা তিনজনের জন্য নিজ হাতে ভাঁড়ে করে চা এগিয়ে দিতেই দাশু প্ল্যাটফর্মের উপর থেকে ভাঁড়শুদ্ধ সেই চা ছুঁড়ে ফেলে দিল রেল লাইনের ব্যালাস্টের উপর।

সিগন্যাল হয়ে গেছে। ধোঁয়া ছেড়ে কলকাতাগামী গাড়ি মন্থর গতিতে এসে ঢুকল স্টেশনে। ছোট্ট স্টেশন হলে কি হয়—গাড়ির সংখ্যা কম—তাই প্ল্যাটফর্মে বেশ লোকজন। গাড়িটার এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করে কাকে যেন খুঁজতে লাগল মিঠুয়া। প্ল্যাটফর্ম নিচু হওয়ায় জিনিসপত্র নিয়ে কামরায় ওঠা-নামা বেশ অসুবিধে। অকৃতজ্ঞ বাবুদের লটবহর নিয়ে স্বয়ং সোমরাই তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

সেই কামরা থেকেই বোঝাসহ গাড়ি থেকে নামতে এগিয়ে এল পাকুরের হাট থেকে ফেরা এক বৃদ্ধা। কিন্তু বাবুদের উঠতে দেখে সে একপাশে সরে দাঁড়াল। শহুরে বাবুরা ততক্ষণে কামরায় উঠে গেছে। কামরায় উঠেই দাশু খেঁকিয়ে উঠল, যতসব ছোটলোক, বিনা টিকিটে

যাবে—আর বোনাফাইড প্যাসেঞ্জারদের সব দুর্ভোগ! এই বলে এক লাথি মেরে বুড়ির বোঁচকা নিচে ফেলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা মেরে সেই বুড়িকেও ট্রেনের কামরা থেকে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মের উপর। নিজের বোঁঝার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল বুড়ি-মা। ততক্ষণে তাকে কোলে তুলে নিয়েছে সোমরা। আশেপাশে কামরায় লক্ষ্য করা মিঠুয়া তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলে উঠল, আরে মাই…।

মিঠুয়ার মা শুধু বলে উঠল, মানুষ লয় গো পশু বটে!

সবুজ ইঙ্গিতে ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। প্রখর দৃষ্টিতে বাবুদের দিকে তাকিয়ে রইল মিঠুয়া। দাঁতে দাঁত চেপে তার চোয়াল ফুলে উঠল। দুই হাতের আঙুল মুষ্টিবদ্ধ হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে আস্তে আস্তে আবার শিথিল হয়ে গেল তার। মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুধু বেরিয়ে এল দুটি কথা—শালা শূয়ারের বাচ্চা!

সতীদাহ

তিন ছেলের পর এক মেয়ে। তাই বাবা মা বড় আদর করে তার নাম রাখল অন্তরা। ডাকনাম অবশ্য ছোটবেলা থেকেই ছিল খুকু। আদর যত্নের আতিশয্য দেখে সবাই বলতে লাগল—মেয়ে তো নয় যেন রাজকন্যে। সেগুন কাঠের স্ট্যাণ্ডযুক্ত নাইলন সুতোর মশারি, ডাকব্যাক কোম্পানীর অয়েলক্লথ, বর্জ্য নির্গমনী ন্যাপকিন, জনসনের পাউডার, সুদৃশ্য পেরামবুলেটর—এসব ব্যবস্থা দেখে সবার মাথা ঘুরে গেল। বয়স সবে এক বছর পেরিয়েছে এরই মধ্যে খুকুর জন্য পলিথিন কমোডের ব্যবস্থা, দাঁড় করাবার জন্য চারিদিক ঘেরা স্ট্যাণ্ড। চীনা মাটির বাথটবে স্নান এবং কলগেট কোম্পানীর পেস্ট ও ব্রাশে মুখ ধোয়া শুরু হয়ে গেল। ব্যাপার স্যাপার দেখে সবার তো একেবারে চক্ষুস্থির।

দামী পেরামবুলেটরের উপর বসিয়ে সেদিন খুকুর বাবা সতীশ ঘোষাল মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছেন একটু বেড়াতে। চাকর-বাকরের উপর তিনি ভরসা করতে পারেন না পাছে কোনো বিভ্রাট ঘটায়। তাকে দেখে তার প্রতিবেশী বিলাস চক্রবর্তী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, ঘোষাল মশাই, মেয়েকে নিয়ে চললেন কোথায়?

—একটু খেলার মাঠের দিকে যাচ্ছি। গরমে সারা দুপুর মেয়েটা বড্ড কষ্ট পেয়েছে। আর বলবেন না চক্কোত্তি মশাই—ভাদ্র মাসের এই পচা গরম—একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই···

—ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন। তা···মেয়ের হাতেখড়ি দেবেন কবে, ঘোষাল মশাই?

—সে-তো জানতেই পারবেন। আমার খুকুর হাতেখড়ি হবে আর পাড়া-প্রতিবেশী জানবে না—এ কখনো হয়, চক্কোত্তি মশাই?

—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। খুকুর মুখেভাতে আপনি যে কাণ্ড করেছিলেন, সে-কথা এ তল্লাটের মানুষ কখনো ভুলবে না।

'কী যে বলেন, বিলাসবাবু'—এই কথা বলে পেরামবুলেটরের পেছনের হাতলে আলতোভাবে ঠেলা দিতে দিতে ঘোষাল মশাই মেয়েকে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। খোলা মাঠের মুক্ত হাওয়া গায়ে লাগতেই খুকু খিলখিল করে হেসে উঠল।

দেখতে দেখতে খুকুর হাতেখড়ি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। মুখেভাতের মতন সে-রকম জাঁকজমক না হলেও এ-ক্ষেত্রেও পাড়াপড়শিরা কেউ বাদ পড়ল না। তারপর আস্তে আস্তে বড় হতেই লেখাপড়ার সঙ্গে খুকুর গান, নাচ, ছবিআঁকা কোনো কিছুরই বাদ রইল না। সব ব্যাপারেই তার দখল সবার চোখে ফুটে উঠল। তবে সব চাইতে গানেই তার দক্ষতা প্রকাশ পেল বেশি।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একদিন পাড়ার ছেলেরা সতীশবাবুকে অনুরোধ করল তার মেয়েকে অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য। তার স্ত্রী বিনতাদেবীর কথায় প্রথমে তিনি আপত্তি করলেন। কিন্তু পাঁচজনের চাপে পড়ে শেষে তাদের কথায়ই রাজী হয়ে গেলেন সতীশবাবু। খুকুর গলায় সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। গান শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। এইটুকু বয়সে যে মেয়ে এরকম সুন্দর গান গাইতে পারে, ভবিষ্যতে সে যে অনেক বড় শিল্পী হবে সে-বিষয়ে কারো মনেই কোনো সন্দেহ রইল না।

বাড়ি ফিরতেই খুকুকে নিয়ে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেল পাড়ার নেতাজী ক্লাবের হর্তাকর্তা সঞ্জয় ব্যানার্জী বলে উঠলেন—কি মাসীমা, বলেছিলাম না আপনার মেয়ে একটা কাণ্ড ঘটাবে। দেখলেন তো সবাইকে কি রকম চমকে দিল। আরে আমরা সব বুঝতে পারি।

সঞ্জয়ের সাগরেদ তোতলা বাবলাও তার সঙ্গে ছিল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, মা-মা-সীমা, আ-আ-আ্প-নার মে-মে-য়ে না খু-উ-উব ব-ব-ব-ড় শি-শি-ল্পী হ-বে। আ-আ-প্নি দে-দে-দেখে

নে-এ-এ-বেন।

বিনতা—তোমরা আশীর্বাদ করো ও যেন মানুষ হয়—ও যেন জীবনে বড় হতে পারে।

সঞ্জয়—নিশ্চয়ই মাসীমা। দেখবেন খুকু বড হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে—আমাদের পাড়ার মুখ উজ্জ্বল করবে।

বাবলা—জা-জা-নেন মা-মা-সীমা, আ-আ-মার ও-ও-ওনা শি-শি-ল্পী হ-হ-বার ই-ই-চ্ছে ছি-ছি-ল। কি-কি-ন্তু এ্যা-এ্যা-এ্যাতো তো-তো-তোত্-লালে কি-কি আর শি-শি-ল্পী হ-হ-ওয়া যা-যায়?

সঞ্জয়—নে তোকে আর শিল্পী হতে হবে না। একটা কথা বলতে যে মানুষ দশবার হোচট খায় সে হবে শিল্পী? আসরে বসলে তুইতো ঢিল খেয়ে মরবিই—সেই সঙ্গে আমারাও বাদ যাবো না।

বিনতা—ওভাবে বলছো কেন বাবা। সবাই কি গান গায়? অন্য কিছুতো বাবলা করতে পাবে। এই যেমন ধরো খেলাধূলা।

বাবলা—হ্যা হ্যা মা-মা- সীমা, খে-খে-লা ধূ-ধূ-লা আ-আ-আমি ক-ক-রি। এ-এ-ই যে-যে-মন ফু-ফু-ফুট ব-ব-বল।

সঞ্জয়—ফু-ফু-ফুটবল। তুই একেবারে গোষ্ঠ পাল, বলরাম, চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জী হবি নাকি?

বিনতা—কেন বাবা ওকে নিরাশ করছ? একদিন হতেও তো পারে।

'তবেই হয়েছে'—এই বলে সঞ্জয় বাবলার হাত ধরে সেখান থেকে বিদায় নিল।

স্নেহভরে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ঘরে প্রবেশ করলেন বিনতাদেবী।

খুকু এখন বড় হয়েছে। তাই বাড়ির সবাই তাকে অন্তরা বলে ডাকে। মা শুধু তার মেয়েকে অভ্যাসবশত খুকু বলে হাক দেয়। এই নিয়ে অন্তরার বড়দা দীপক তার মাকে একদিন বলেছিল, মা, তুমি এখনও ওকে খুকু বলে ডাকবে? আমার বোন বুঝি বড় হয়নি?

ছোট ছেলে রূপকও তার সুরে মাকে বলল, জানো দাদা, মা মনে করে আমাদের অন্তরা যেন এখনো সেই খুকুই রয়েছে। ও যে বড় হয়েছে—সেটা যেন মা'র চোখেই পড়ে না।

বিনতাদেবী তার ছেলেদের বললেন, ও—খুকু বড় হয়ে গেছে বুঝি! তাইতো আমার তো নজরেই আসেনি যে খুকু বড় হয়ে গেছে! কথাগুলো বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস বিনতাদেবীর বুকের ভিতর থেকে এক অজানা আতঙ্কে বের হয়ে তার সমস্ত শিরা-উপশিরা অবশ করে ফেলল। অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের বেদনা যেন তিনি অনুভব করলেন মর্মে মর্মে।

অন্তরার বয়স এখন পনের। যৌবনের ছোঁয়া তার সমস্ত শরীরে। তিল তিল রূপ সংগ্রহ করে যেমন তিলোত্তমা তৈরি হয়েছিল সেইরূপ জগতের সমস্ত সৌন্দর্য যেন অন্তরার দেহে আশ্রয় নিয়েছে। এলো চুলে লাল পেড়ে গরদের শাড়ি পরে যখন সে প্রতিদিন ঠাকুরের সামনে ভক্তিগীতি গায় তখন তাকে ঠিক স্বর্গের দেবীর মতোই মনে হয়।

স্কুলে সেদিন ছিল ইতিহাসের ক্লাস। মাস্টারমশাই রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শত শত বছর ভারতের বুকে সতীদাহ প্রথা এবং সেই প্রথা রদ করার উদ্দেশ্যে রামমোহনের আজীবন সংগ্রামের কথা উল্লেখ করলেন। ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার কথা মনে পড়তেই ব্যাপারটা কেমন যেন একটা খটকা বলে মনে হল অন্তরার কাছে। তাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা হল তার।

—আচ্ছা বাবা, সত্যিই কি আমাদের দেশের মেয়েদের তার স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে হত?

—হ্যা মা, অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য। রামমোহনের আগে সত্যি সত্যি আমাদের দেশের হতভাগ্য নারীদের অসহায় অবস্থায় স্বামীর চিতায় পুড়ে মরতে হত বা আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় পুড়িয়ে মারা হত!

—বাবা, তুমি একদিন বলেছিলে—পাঁচ হাজার বছর আগে এই

ভারতবর্ষের বুকে বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে—আর সেই দেশের মাটিতে···

—হ্যাঁ মা, একদিকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে উঠেছিল এই দেশ আবার অন্যদিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিজেদের পৌঁছে দিয়েছিল পাতালে। একথা ভাবা যায় না।

পরদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে অন্তরা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিকৃতি কিনে এনে ঠাকুর ঘরে টাঙিয়ে রাখল। আর প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরের ভক্তিগীতির সঙ্গে সে গাইত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই প্রিয় গান—আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো···

অন্তরা তার স্কুল জীবনের সবশেষ পরীক্ষায় অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে আগামী বছর। তাই দিনরাত শুধু লেখা আর পড়া, পড়া আর লেখা! বাবা এবং মা দুজনেরই অন্তরার প্রতি সজাগ দৃষ্টি। এপ্রিল মাসের গরমে পরীক্ষার সময় মেয়ের কী ভয়ানক অসুবিধা হবে এই কথা ভেবে দুজনেই উতলা হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হল এবং ভালয় ভালয় শেষও হয়ে গেল। অন্তরা সব বিষয়েই ভাল পরীক্ষা দিয়েছে। কাজেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

যেটা ভাবা হয়েছিল, পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা গেল ঠিক তাই-ই হয়েছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে অন্তরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই বাবা এবং তার দুই দাদা প্রত্যেকে যখন একটি করে গেজেট হাতে ঘরে প্রবেশ করল তখন সমস্ত বাড়িতে একটা হৈহৈ পড়ে গেল। উচ্ছ্বাসবশত সতীশবাবু পাড়ার সবাইকে প্লেটভর্তি মিষ্টিমুখ করাবার পর বললেন, আপনাদের সকলের আশীর্বাদেই খুকু আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করেছে।

এই কথা শুনে বড় ছেলে দীপক বাবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, বাবা, মাধ্যমিক পাশ করার পরও অন্তরাকে তুমি খুকু বলে ডাকবে!

দীপকের কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। পাড়ার চক্রবর্ত্তী মশাই বললেন, আমি দীপকের কথায় একমত। সত্যিই তো আমাদের খুকুমণি আর এখন খুকুমণি নেই। তারপর সতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ঘোষাল মশাই, এবার মেয়ের পাকাপোক্ত একটা ব্যবস্থা করুন। অম্বরা এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

এইসব কথা শুনে অম্বরার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এবং মাথা নিচু করে সে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল দ্রুতপায়ে। মেয়ের কাঁধ ধরে তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিলেন বিনতাদেবী।

ছোট ছেলে রূপক মা'র পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে চক্রবর্ত্তী মশাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—না না, মেসোমশাই, অত তাড়াতাড়ি আমরা বোনকে পরের ঘরে পাঠাচ্ছি না! উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ও কলেজে ভর্তি হবে। কলেজের পড়া শেষ করার পর তবেই ওসব কথা ভাবা যাবে।

অম্বরা ছোড়দার দিকে জিভ দেখিয়ে একটা ভেঙচি কেটে দ্রুতপায়ে ছুটে গেল দোতলার পড়ার ঘরের দিকে। সবাই 'অম্বরা অম্বরা' করে পিছুডাক দিল, কিন্তু অম্বরায় স্পষ্ট কথা, বাজে কথা শোনার মতো সময় আমার নেই।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অম্বরাকে ভর্তি করে দেওয়া হল বেথুন কলেজে। কিন্তু চতুর্দিক থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে থাকায় সতীশবাবু নিজেই উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের চাপে সেই সঙ্কট হয়ে উঠল আরও গভীর। অনেক জায়গা থেকে আসা অনেককে এ ব্যাপারে নিরাশ করার পর শেষে হাওড়া জেলার বাতেলা গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার নীলকান্ত রায়চৌধুরীর বড় ছেলে নীলাম্বরের সঙ্গে অম্বরার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। ছেলে সুপুরুষ—বেশ উঁচুলম্বা—ডাকাবুকো এ্যাডভোকেট—কলকাতা হাইকোর্টে নিয়মিত প্র্যাকটিস করে।

দাবী দাওয়ার বহর নেহাত কম নয়। ছেলের গাড়ি কেনার জন্য

নগদ এক লাখ সত্তর হাজার, চল্লিশ ভরি সোনার গয়না, ওনিডা কালার্ড টিভি, গোদরেজ ফ্রিজ, অডিও-ভিডিও, ওয়াশিং মেশিন, এ্যাকুয়া গার্ড আরও কত কি। সর্বকিছু মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ব্যাপার। এই বিশাল পরিমাণ টাকার যোগাড় করতে সতীশবাবু তার চাকরি জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ একত্র করেও কোনো কুল-কিনারা করতে পারলেন না। শেষে দুই ছেলেকে বলে তাদের অফিস থেকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার করে তিন লক্ষ টাকা ধার করার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

পণের বহর দেখে অন্তরা প্রথমে প্রস্তাবিত এই বিয়ের প্রতিবাদ করল বেশ জোরালোভাবেই। কিন্তু তার মা তাকে বুঝিয়ে বলল, দেখ্ মা, ওরকম বনেদি পরিবার বড় একটা চোখে পড়ে না। তুই টাকার কথা ভাবছিস? তোর বাবার সারা জীবনের জমানো টাকা তো এই জন্যই রাখা আছে। আর তোর দুই দাদাও তো এখন বেশ মোটা মাইনের চাকরি করছে।

—আচ্ছা মা, আত্মীয়-কুটুম হবে আপনজনের মতো। এর মধ্যে টাকা পয়সার লেনদেন কেন?

—শোন বোকা মেয়ের কথা। আচ্ছা তুই-ই বল্—এই সংসারে সব মেয়ের বিয়েতেই তো কিছু না কিছু দিতে হয়। ওরা না হয় একটু বেশি চেয়েছে।

—কিন্তু মা, সেটা হবে কেন? ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কেন নিজে জিনিস করতে পারবে না? পরের কাছে হাত পাততে হবে কেন? এই করেই তো তোমরা ওদের লোভ বাড়িয়ে দাও।

—দেখ্, ওরা আগে ছিল শুধু রায়—বনেদি হবার পর শেষে হয়েছে রায়চৌধুরী। ওরকম পরিবার পেতে হলে কিছু দিতে হয়।

মনে 'কিন্তু কিন্তু' থাকা সত্ত্বেও অন্তরাকে শেষ পর্যন্ত এই বিয়েতে মত দিতে হল শুধু তার বাবা-মা'র মুখ চেয়ে।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিনও আস্তে আস্তে ঘনিয়ে এল। সবার

মুখেই আনন্দের ছাপ, কিন্তু অন্তরার ভিতরটা দুরুদুরু করতে থাকে এক অজানা আতঙ্কে।

বিয়ের ঠিক এক সপ্তাহ আগে থেকেই আত্মীয়স্বজন আসতে শুরু করে দিল বিয়ে বাড়ি। নিজেদের বিশাল দোতলা বাড়িতে সবার জায়গা দেওয়া সম্ভব হল না। প্রতিবেশী চক্রবর্তী মশাই তার বাড়ির একটা বড় অংশ প্রয়োজনে ছেড়ে দিলেন সতীশবাবুকে।

বাড়ির সামনে তৈরি হল বর্গাকার বিশাল প্যাণ্ডেল। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য বৃত্তের আকারে রাখা হল সুদৃশ্য চেয়ার আর ঠিক তার কেন্দ্রবিন্দুতে সিলিঙে ঝুলিয়ে দেওয়া হল বিরাট এক ঝাড়বাতি। দেখতে দেখতে বিয়ের সানাই বেজে উঠল।

'বর এসে গেছে' বলে সবাই ছুটোপুটি করে শাঁখ বাজাতে বাজাতে প্যাণ্ডেলের সামনে এসে হাজির হল। সুসজ্জিত ট্যাক্সি থেকে বরকে নামিয়ে তাৎক্ষণিক স্ত্রী-আচার শেষ করে তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। ভাড়া করা গাড়ি থেকে নেমে কালো ছড়ি হাতে কালো কুচকুচে পাম-শুর শব্দে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসলেন বরের বাবা নীলকান্ত রায়চৌধুরী। দু'চোখ টান টান করে তিনি শুধু চারিদিক দেখতে লাগলেন কন্যাপক্ষের কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না। অবশেষে ত্রুটিহীনভাবেই অন্তরার বিয়ে শেষ হয়ে গেল মহা ধূমধাম করে।

বিদায়ের ক্ষণে বিনতা দেবী অন্তরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপের সুরে কাঁদতে লাগলেন, খুকু, তোকে ছেড়ে আমি কী করে থাকবো? সতীশবাবু নীলকান্ত রায়চৌধুরীর হাত দু'টি ধরে বাকরুদ্ধ স্বরে বললেন, বেয়াই মশাই, আমার একমাত্র মেয়েকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনি নিজের মেয়ের মতো..., শেষটুকু তিনি আর শেষ করতে পারলেন না—হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

দীপক আর রূপক তাদের ভগ্নিপতি নীলাম্বর ও অন্তরাকে চোখের জলে সুসজ্জিত ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিল। অপেক্ষমান ট্যাক্সিও মুহূর্তে রওনা হয়ে গেল হাওড়া জেলার বাতেলা গ্রামের দিকে। ট্যাক্সি চোখের

আড়াল হতেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোষাল পরিবারে নেমে এল বিরহ মৃত্যুর শোকের ছায়া।

শ্বশুর বাড়ির অবস্থান দেখে অন্তরার বুক আঁতকে উঠল এক অজানা কারণে। বাড়িটি হুগলী নদীর একেবারে এক ধারে অবস্থিত। কিছুটা দূরেই একটা জুট মিল। সেই জুট মিলের চিমনি থেকে কালো কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে দিনরাত। মিলের বর্জ্য পদার্থ একটা নলের মুখ দিয়ে গড়িয়ে এসে পড়ছে পবিত্র গঙ্গার বুকে।

দোতলাবাড়ির ছাদ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তরা একদিন সেই দৃশ্য দেখছিল একমনে। হঠাৎ তার শাশুড়ি বিলাসিনী দেবী তাকে প্রায় ধমকের সুরে বললেন, বৌমা, তুমি আইবুড়ো মেয়েদের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছো বাইরের দিকে?

—না মা, গঙ্গার বুকে কত সব নোংরা পড়ছে—তাই দেখছিলাম।

—মা গঙ্গার বুকে নোংরা! কী সব অলুক্ষুণে কথা বলছো? বৌদের মুখে এসব কথা মানায়? কথায় বলে পতিতপাবনী গঙ্গা? বলি, তোমার বাপ-মা তোমাকে কোনো লেখাপড়া শেখায়নি, গা!

—আজ্ঞে মা, আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—ন্যাকা! একটা কথা স্পষ্ট বলে দিচ্ছি বৌমা, ঘরের বৌ ঘরের বৌ-এর মতো থাকবে! কোনো বেয়াদপি কিন্তু আমি সহ্য করব না!

নীলাম্বর কোর্ট থেকে ফিরে আসতেই ছেলের নিকট সাত কাহন শুরু করলেন বিলাসিনী দেবী। তার নিজের মেয়ে সেই সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ব্যাপারটা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করল। তার মেয়ে চিনু তো বলেই ফেলল, দাদা, বৌদির মাথায় গণ্ডগোল আছে। নতুবা তিনসন্ধ্যে ছাদের উপর অন্ধকারে গঙ্গার দিকে মুখ করে কেউ বিড়বিড় করে?

সব কথা শুনে নীলাম্বরের মন বিষিয়ে উঠল। কথাটা বাড়ির কর্তার কানে যেতেই তিনি তার বাজখাই স্বরে বলে উঠলেন, কাল থেকে

বৌমার ছাতে যাওয়া বন্ধ।

পিতৃভক্ত ছেলে সেই কথা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল তার স্ত্রীকে। এই ঘটনার পর সবাই ছুঁতোনাতা নিয়ে খোঁটা দিতে লাগল অন্তরাকে। তার পক্ষে শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করা দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠল। মাতাল স্বামীকে বলেও এর কোনো বিহিত হল না।

একদিন সতীশবাবু মেয়েকে দেখতে এলেন তার ছোট ছেলে রূপককে নিয়ে। বাড়ির থমথমে পরিবেশ এবং বেয়ানের মুখে শুষ্ক হাসি দেখে তাদের মুখও শুকিয়ে গেল। বড় বড় দু'টি মিষ্টির প্যাকেট বেয়ানের হাতে দিতে উদ্যত হতেই তিনি গম্ভীর মুখে 'ওটা আপনার মেয়েকেই দিন' এই বলে সেখান থেকে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন অন্য ঘরে।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে সতীশবাবু মেয়েকে ভয়ে-ভয়ে শুধু বললেন, খুকু, তুই আছিস কেমন?

—বাবা, আমি ভালোই আছি।

—তোর শাশুড়ি অমন করে চলে গেলেন!

—মা'র এখন পুজোর ঘরে যাবার সময়—তাই।

—ও!

রূপক তার বোনের কাছে গিয়ে বসল, অন্তরা, তোর মুখটা অমন ভার ভার কেন রে?

—কই নাতো!

—কই নাতো মানে! তুই মুখে বললেই হল? আমরা কিছু বুঝতে পারি না মনে করেছিস? বল্ কী হয়েছে?

—নারে দাদা, সত্যি বলছি কিছুই হয়নি।

মেয়েকে বিয়ে দেবার আগে এই বাড়িতে তিনি যে আদর-যত্নের বহর দেখেছিলেন, তার বিন্দুমাত্র লক্ষণ না থাকায় সতীশবাবুর মন ক্ষোভে দুঃখে ভরে উঠল। তাই ফেরার সময় বেয়াইমশাই-এর পাংশু মুখের মেঁতো হাসি নিয়ে মাথা হেঁট করে বাড়ি ফিরতে হল তাকে।

ছোট ছেলে রূপকের হাত ধরে সতীশবাবু বিদায় হবার পর আড়িপাতা ননদ তার মাকে গিয়ে বলল, মা, তোমার নামে কী মিথ্যে কথাটাই না বলল। তুমি নাকি ওদের আদর যত্ন করনি; ঠাকুরঘরে ঝামটা মেরে চলে গেছ।

মেয়ের বানানো কথা শুনে বিলাসিনী দেবী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং রান্নঘরে ঢুকে বৌয়ের চুলের মুঠি ধরে বললেন, পোড়ারমুখী, আমার নামে বাপের কাছে নালিশ! চোখখাকি, তুই জানিস না কখন আমি ঠাকুর ঘরে যাই। ছোটলোক হাভাতে ঘরের মেয়ে। তোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। দাঁড়া, কোর্ট থেকে নীলু আসুক— আজ তোরই একদিন কি আমার একদিন।

এতবড় আঘাত অন্তরা কখনো পায়নি জীবনে। তার দেবতুল্য বাবা-মা'র প্রতি অশালীন কথাবার্তা শুনে তার মন একেবারে ভেঙে গেল। মানুষ যে এমন কুৎসিত কথা মুখে আনতে পারে এটা তার বোধগম্যের বাইরে। রান্নাঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। তার ছোটবেলার সুখময় স্মৃতি মনে আসতেই তার কান্না বাঁধভাঙা বন্যার মতো এ-কুল ও-কুল দু'কুল ছাপিয়ে পড়ল।

কোর্ট থেকে ফিরে মা'র মুখে সব কথা শুনে নীলাম্বর আশ্চর্য হয়ে বলল, বল কি, মা। তোমাকে অপমান করেছে। এত বড় সাহস।

বিলাসিনী নিজের স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, পই পই করে আমি তোমায় বারণ করেছিলাম—হাভাতে ঘরের মেয়ে এনো না। সে-কথা কি তুমি কানে নিলে। এখন অশান্তি ভোগ কর। তুমি তো ওকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে গদগদ হয়ে গেলে। কী-ইবা এমন ছিরি। ওর চাইতে আমার চিনু ঢের বেশি সুন্দরী।

নীলকান্তবাবু পায়চারি করতে করতে শুধু বললেন, এরকম ছোটলোক জানলে কখনো ওকে ঘরে আনি, গিন্নী। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। আমার নাম নীলকান্ত রায়চৌধুরী। এর একটা বিহিত আমি করবোই করবো।

রোজকার মতো বেহেড মাতাল অবস্থায় শোবার ঘরে ঢুকতেই অন্তরা স্বামীর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল, ওগো, তুমি এই ছাইভস্ম খাওয়া ছেড়ে দাও।

—ছাড়্ বলছি ছোটলোকের জাত। তোর এত বড় আস্পর্ধা যে তুই আমার মাকে অপমান করিস।

—তুমি কী বলছো। বরং তোমার মা-ই তো আজ আমার গায়ে হাত তুলেছে।

—চুপ, মিথ্যেবাদী, হাড় বজ্জাত কোথাকার। এই বলে এক লাথি মেরে তার স্ত্রীকে ছিটকে ফেলে দিল নীলাম্বর।

মেঝের উপর দু'হাত রেখে স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে অন্তরা শুধু বলে উঠল, তুমি।

সমস্ত ঘটনা জানিয়ে স্বামীর মাধ্যমে অন্তরা তার বাবাকে একটা চিঠি দিল, কিন্তু সে-চিঠি সতীশবাবু পেলেন না। চিঠির উত্তর না আসায় বাবা-মা'র প্রতি তার খুব অভিমান হল। দিন দিন আরও ভেঙে পড়ল অন্তরা।

অনেক দিন বোনের কোনো খবর পায়নি। বড়ভাই দীপক তাই অফিসের এক বন্ধুকে নিয়ে একদিন বোনের বাড়িতে হাজির হল।

সমস্ত ভয়ডর উপেক্ষা করে অন্তরা তার দাদা ও তার বন্ধুকে নিয়ে ছাদের উপর গিয়ে সব কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল দাদার কাঁধের উপর। সান্ত্বনার হাত বোনের মাথায় বুলিয়ে দিল দাদা।

সব কিছু শোনার পর দীপক অন্তরাকে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু নীলকান্তবাবু ফরমান জারি করলেন, বৌমার এখন যাওয়া হবে না।

নিরাশ হয়ে দীপক তার বোনের বাড়ি থেকে বন্ধুকে নিয়ে ফিরে এল। অনেক আশা করে বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিল সে বোনের বাড়ি। কিন্তু এভাবে সবার সামনে অপমানিত হতে হবে একথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তার চাপা ক্রোধ তুষের আগুনের মতো ধিকধিক করে জ্বলতে লাগল অন্তরার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে।

এদিকে দীপক বাড়ি থেকে চলে যাবার পরই মায়ে-ঝিয়ে এক শলাপরামর্শ শুরু হল অন্তরাকে নিয়ে।

আড্ডা থেকে ফিরে নীলাম্বর ঘরে ঢুকতেই চিনু তার কানে কানে বলল, দাদা, বৌদির চরিত্তির ভালো না। আজ বৌদির বড়দা এসেছিল তার এক বন্ধুকে নিয়ে। তার সঙ্গে আজ ছাতে গিয়ে অন্ধকারে বৌদি যে-কাণ্ড করল, আমবা কেউ তা ভাবতে পারছি না। তার বুকের উপর মুখ গুঁজে···ছি ছি ছি!

—তুই কী বলছিস, চিনু!

—হ্যাঁ দাদা, আর কিছু আমি মুখে আনতে পারছি না!

বিলাসিনী দেবী তার স্বামীকে বললেন, এই কুলটা মাগীকে বাড়ি থেকে এক্ষুণি দূর করে দাও, নইলে অনর্থ হবে বলে দিচ্ছি!

নীলকান্তবাবু তার ছেলেকে ডেকে আদেশের সুরে বললেন, নীলু, এ বাড়িতে ওর মুখ আমি দেখতে চাই না—এই আমার শেষ কথা!

ছেলেও বিজ্ঞ বিচারকের মতো সঙ্গে সঙ্গে রায় দিল, না, একে নিয়ে আর ঘর করা চলে না!

এই ঘটনার পর রায়চৌধুরী বাড়িতে সব সময় একটা গুপ্ত শলাপরামর্শ চলতে লাগল। নীলাম্বর বেশ কদিন হল তার কোর্টে যাচ্ছে না। সে একবার বাবার ঘরে একবার মা'র ঘরে গিয়ে কী যেন একটা গভীর রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছে। বাড়ির বাইরে কার সঙ্গে যেন সে দেখা করতেও চলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। প্রকৃতির বুকে গুমোট আবেশ। এক অস্বস্তিকর পরিবেশ—যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। এক অজানা আতঙ্কে এদিক ওদিক উড়ে শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে দূরের পাখিরা। মাঝে মাঝে কুবো পাখি ডেকে চলেছে কুব কুব রবে। জানালার শিক ধরে উদাস মনে সেদিকে তাকিয়ে অন্তরা সেই শব্দ যেন নিজের বুকের ভিতর অনুভব করছে।

হঠাৎ কালবৈশাখীর মতো একটা ঝড় এসে আচ্ছন্ন করে ফেলল

আকাশ বাতাস। ঘরের দরজা-জানলা খটাখট শব্দে সজোরে আছড়ে পড়তে লাগল দমকা হাওয়ায়। চারিদিক ঘোর অন্ধকার করে ঝড়বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল আকাশের কোণে কোণে।

এমন সময় কোথা থেকে নীলাম্বর ঘরে ঢুকেই বাবাকে বলল, থানায় এক 'লরি' টাকা দিয়ে এসেছি। এখন কোনো শালাকে আমি পরোয়া করি না।

বিলাসিনী দেবী ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যা করার খুব সাবধানে করিস, নীলু। তারপর মেয়েকে চকিতে নির্দেশ দিলেন, চিনু, এ-ঘর থেকে টিন দুটো চটপট ও-ঘরে নিয়ে যা তো।

মন্ত্রবৎ চিনু টিন দু'টো তার দু'হাতে শক্ত করে ধরে যথাস্থানে পৌঁছে দিল মায়ের নির্দেশ মতো।

আকণ্ঠ মদ্যপ অবস্থায় নিজের ঘরের ভিতর ঢুকল নীলাম্বর। বর্মী খাটের একটা ষ্ট্যাণ্ডের উপর নিজের মাথাটি রেখে বাপের বাড়ির কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিল অম্বরা। স্বামী কখন ঘরে ঢুকেছে সেটা তার নজরেই আসেনি। নীলাম্বর স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, স্বামীর ঘরে বসেও তোর নাগরের চিন্তা।

—ওগো তুমি কাকে কী বলছ! তুমি আমাকে ওভাবে মারছ কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

—চুপ কর্, বদমাশ মাগী। তোর মুখ দেখাও পাপ। এই কথা বলে মারতে মারতে ফেলে দিল তাকে মেঝের উপর।

শেষে অম্বরার দু'টো পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল নীলাম্বর। তারপর পিঠমোড়া করে তার হাত দু'টোও বেঁধে দিল সেই পাষণ্ড। তৎক্ষণে নীলকান্ত ও বিলাসিনী একসঙ্গে এসে ঢুকলেন সেই ঘরে। তাদের দু'জনার চোখেমুখে পৈশাচিক দৃষ্টি।

অম্বরা প্রাণপণ চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ওগো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—আমাকে মেরো না। আমার পেটে যে তোমার বাচ্চা—অন্তত ওকে বাঁচতে দাও।

—চুপ! হারামজাদী খান্‌কি মাগী কোথাকার। কোত্থেকে কাকে দিয়ে পেট বাঁধিয়ে এখন আমার নামে··· !

—তুমি মানুষ না জানোয়ার! তোমরা না রায়চৌধুরি বংশের লোক। এই তোমাদের বনেদী বংশের পরিচয়! আমি চেঁচিয়ে সবাইকে বলে দেবো। তোমাদের মুখোস আমি সবার সামনে তুলে ধরবো।

নীলকান্ত রায়চৌধুরী তার বাজখাই গলা হঠাৎ খাদে নামিয়ে ছেলেকে বললেন, নীলু, বেশি চেঁচামেচি করতে দিস না। বাইরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে—এই সুযোগ। এর মধ্যেই কাজটা শেষ করতে হবে।

বিলাসিনী দেবী ঘাবড়ে গিয়ে তার ছেলেকে বললেন, খোকা, আমার ভীষণ ভয় করছে। যা করবার শিগগির করে ফেল্, বাবা।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়াতে গিয়ে শাণের উপর পড়ে মাথা ফেটে গেল অন্তরার। ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত ঝরে তার সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে মিশে রক্তবর্ণ মেঝে আরও রক্তিম হয়ে উঠল। বন্ধ ঘরে এখন তার সামনে শুধু তার স্বামী আর শ্বশুর-শাশুড়ি।

ততক্ষণে অন্তরা সব বুঝতে পেরেছে। সে শাশুড়ির পায়ে মাথা ঠুকে বলতে লাগল, মা—মাগো, আমার পেটে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর। তোমরা আমাকে মেরো না—তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও—তোমরা তোমাদের বংশের মাণিককে বাঁচতে দাও!

বাবার ইঙ্গিতে নীলাম্বর তার পকেট থেকে লিউকোপ্লাস্ট বের করে চটপট লাগিয়ে দিল অন্তরার মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে তার বাক-শক্তি রুদ্ধ হয়ে মুখ থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুতে লাগল। বাকরুদ্ধ অন্তরার তথাপি বাঁচার আকুতি প্রকাশ পেল তার সজল দৃষ্টিতে।

পাপিষ্ঠ নীলাম্বর দুই টিন কেরোসিন তার স্ত্রীর গায়ে গঙ্গা জলের মতো ঢেলে দিল। তারপর তার ডান পকেট থেকে লাইটার বের করে আগুন জ্বালিয়ে দিল অন্তরার গায়ে। বাকশূন্য অবস্থায় গোঁঙাতে গোঁঙাতে দেবী দুর্গার মতো বড় বড় দু'টো চোখ মেলে অন্তরা দেখতে

লাগল সবাইকে। অকস্মাৎ সতীদাহের একটা জীবন্ত দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

তান্ত্রিক পোশাকে সজ্জিত তার শ্বশুর এক হাতে ত্রিশূল আর অন্য হাতে শিঙা নিয়ে বাবরি চুলে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে উন্মাদের মতো শুধু ঘুরছে তার চারদিকে। রুদ্রাক্ষের মালাপরা তার শাশুড়িও গেরুয়া রঙের শাড়ি পড়ে চিমটা হাতে পাগলিনীর মতো তার পাশে শুধু নৃত্য করছে। তার ননদ লাল শাড়ি পড়ে আলুথালু বেশে চুল এলিয়ে তার দিকে চেয়ে খালি খিলখিল করে হাসছে। কারা যেন ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া নিয়ে কান ফাটানো শব্দে বাজিয়ে চলেছে চারিদিক। তার স্বামী ষণ্ডা-গণ্ডা মূর্তিমান এক যমদূতের মতো দু'হাতে গাঁটযুক্ত বাঁশ নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর বিকট এক হাসির ফোয়ারা তুলে তার মাথায় সজোরে এক আঘাত বসিয়ে দিল গাঁটযুক্ত সেই বাঁশ দিয়ে। সেই আঘাতের ভার সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না অন্তরার। তার দেহ চিরতরে লুটিয়ে পড়ল সবার সামনে।

দোতলার ঘরে ততক্ষণে জীবন্ত চিতার লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে।

বিনতা দেয়ান

বিনতা দেয়ান—জাহাজ-নিগম দপ্তরের কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী—সেদিন অফিস যাবার পথে হঠাৎ ঋতুমতী হয়ে পড়লেন এবং তিনি তার কেয়ার-ফ্রি প্যাড পরতেও ভুলে গেলেন এক নজীরবিহীন বিস্মৃতির মায়াজালে। ফলে তার মেনষ্ট্রুয়্যাল ডিসচার্জ সায়া ভেদ করে শাড়ি ভেদ করে পেছনে একটা উল্টো ত্রিভুজের আকার ধারণ করল যেটা সরকারি ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ঠিক হুবহু এক মনোগ্রাম। সেই ওলটানো রক্তিম ত্রিভুজ যথাস্থানে ধারণ করার জন্য বিনতা দেবীর চেয়ার তার চারটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সাগ্রহে দু'হাত বাড়িয়ে দিল পরম উল্লাসে তাকে ধারণ করার জন্য। কুশনযুক্ত চেয়ারের রিভলভিং দু'টি হাতল বিনতা দেবীর কোমর জোরে চেপে ধরে বারবার পরম তৃপ্তির শ্বাস ঘনঘন ছাড়তে লাগল মাঝখানের সেই কোমল অংশের সংস্পর্শে।

বিনতা দেবী মাঝবয়সী। বেশ কিছুদিন হল এক ছেলেকে রেখে তার স্বামী অধীর দেয়ান তাকে ফেলে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। গায়ের রং একটু চাপা হলেও বিনতা দেবীর দেহের গঠন নিখুঁত। আটসাট বাঁধন, ছিমছাম গড়ন, ঘনকালো চুল এবং টানাটানা দু'টি চোখ। বস্তুত শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া ভারে সজ্জিত আগের চাইতে সাদা-মাঠা সাজে বিধবার বেশে এখন তাকে অনেক বেশি সুন্দর দেখায়।

ঘটনাটি জাহাজ-নিগম দপ্তরের সবার চোখ এড়িয়ে গেলেও সেটি একজনের নজর এড়াতে পারেনি যার নাম সুধীর কুশারী। ব্যাপারটা তার নজরে পড়তেই তিনি তার চশমার ফাঁক দিয়ে সতর্কভাবে এদিক ওদিক দেখে নিলেন—তিনি ছাড়া আর কারও নজরে সেটা পড়েছে কিনা। দেখে শুনে যখন বুঝলেন ব্যাপারটা আর কারও বোধগম্য

হয়নি তখন তিনি আবার এক মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন এই ভেবে যে, কী করে এহেন ঘটনা এক মহিলার নিকট প্রকাশ করা যায়। কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না কীভাবে তিনি বিনতা দেবীকে নিজে এই কথাটা বলবেন। আকাশ পাতাল ভেবেও তিনি কোনোকিছু স্থির করতে পারলেন না। ভাবতে ভাবতে তার সমস্ত শরীর গলদঘর্ম হয়ে গেল এবং দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে বিনতা দেবী কীরকম এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, সেটা ভেবে তিনি আবার ভীষণ শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শেষে ঠিক করলেন বিনতা দেবীকে ব্যাপারটা যে করে হোক বলতেই হবে। কেন না জাহাজ-নিগম দপ্তরে আর কোনো মহিলা কর্মী নেই যার সাহায্য নিয়ে সুধীরবাবু সরাসরি বিনতা দেবীর মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। কাজেই নিজে যাওয়াই ঠিক করলেন এবং আসলে কেন তিনি বিনতা দেবীর কাছে যাচ্ছেন সেটা সন্তর্পণে ক্যামাফ্লেজ করার জন্য বিনতা দেবীর চেয়ারের সামনে এসে হাজির হলেন বগলে একটি ফাইল নিয়ে।

আকস্মিক একজন অনধিকারীকে প্রবেশ করতে দেখে বিনতা দেবীর চেয়ারের মাথাটি তির্যক দৃষ্টিতে স্নায়ুচাপগ্রস্ত সুধীর কুশারীকে একেবারে বিবশ করে তুলল।

বিনতা দেবী প্রথমে খানিকটা অপ্রতিভ হলেন। কারণ সুধীরবাবু অফিসে এই প্রথম তার চেয়ারের সামনে এসে হাজির হয়েছেন। কুশারীবাবু খুব নিরিবিলি প্রকৃতির মানুষ। নিজের কাজেই সবসময় ব্যস্ত থাকেন। যা হোক সাধারণ ভদ্রতায় পাশের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, মিঃ কুশারী! বলুন কী ব্যাপার?

—আজ্ঞে তেমন কিছু নয়।

—দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

—ধন্যবাদ।

—বলুন কী ব্যাপার!

—না ব্যাপার তেমন কিছুই নয়।

—তবে আমতা আমতা করছেন কেন?

—কই, না তো!

—তবে বলুন না কী হয়েছে!

—আজ্ঞে দেখুন মিসেস্ দেয়ান। ব্যাপারটা আমি…মানে…আমি…আপনাকে…

—ব্যাপারটা! কী ব্যাপার?

—না মানে ব্যাপারটা আমি বলতে চাইনি।

—বলতে চাননি! কিন্তু কেন?

—না…মানে…আমি…আপনাকে…বলতে…মানে…

—কী আশ্চর্য! আবার আমতা আমতা করছেন!

—না…মানে…বলতে…আর কি…

—কী আশ্চর্য বলুন না!

ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয় দেখে সুধীর কুশারী আরো নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল তার কপালে। জিভ চটচট করতে লাগল তার প্রচণ্ড তেষ্টায়। সবকিছু দেখেশুনে বিনতা দেবীর মুখও গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি গম্ভীর স্বরেই সুধীরবাবুকে বললেন, ঠিক আছে, আপনি বলুন না সবকিছু।

—আপনি কিছু মনে করবেন না।…মানে…আমি নিতান্তই অসহায়…মানে…না বলে পারছি না…তাই আর কি।

—বেশ তো বলেই ফেলুন না।

—ভেবেছিলাম বলব না…মানে…এসব বলার কথা নয়! কিন্তু আপনার কথা ভেবে না বলে পারছি না।

—কী মুশকিল, আপনাকে তো আমি বলছি বলতে।

—মানে মিসেস্ দেয়ান! বুঝতেই পারছেন এবং আমি আগেই

বলেছি এটা বলার মতো কথা নয়···কিন্তু কী অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আপনি পড়বেন সেই কথা ভেবে···মানে···আপনার জন্যই আর কি···

—কেন হেঁয়ালি করছেন! আপনি বলুন না কী অন্যায় আমি করেছি?

—ছি ছি, কি বলছেন মিসেস দেয়ান! আপনি অন্যায় করতে যাবেন কেন! মানে ব্যাপারটা এতো স্পর্শকাতর যে বলতে আমার মোটেও ইচ্ছে ছিল না···কিন্তু···

—কুশারীবাবু আমি আপনাকে সম্পূর্ণ অভয় দিলাম; আপনি নির্ভয়ে আমাকে সব বলতে পারেন।

—হ্যাঁ মানে···আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন, তখন···মনে কিছু করবেন না, মিসেস্ দেয়ান, মানে···আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আর কি···

—কী আশ্চর্য! বলুন না!

—মানে···ব্যাপারটা হল···মিসেস্ দেয়ান···আপনি ঋতুমতী হয়েছেন, কিন্তু প্রোটেকশন নিতে ভুলে গেছেন।

—অ্যা! বলেন কি! বলেই তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তিনি দেখেন, সত্যি শুধু নিজের সায়া বা শাড়ি নয়, একেবারে চেয়ার-কুশানে পর্যন্ত রক্তের দাগ লেগে গেছে। নিমেষে কুশারীবাবুর হাত দু'টো ধরে তাকে বসতে বলেই তিনি তাড়িঘড়ি ছুটলেন টয়লেটে।

সুধীর কুশারী এমনিতে নম্র স্বভাবের লোক। সবার সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই! কাজেই এহেন সুধীরবাবুর ফাইল বগলে মিসেস দেয়ানের কাছে আসা, এতক্ষণ গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করা এবং শেষে মিসেস দেয়ানের কুশারীবাবুর হাত মৃদু চেপে নায়িকার ভঙ্গিতে লেডিজ ল্যাভে যাওয়া—এসব কারো নজর এড়াল না। এমনকি টয়লেটে যাবার সময় তার পেছনের রক্তমাখা ওলটানো ত্রিভুজের মনোগ্রামটিও অনেকের নজরে পড়ল।

ল্যাভাটরি থেকে প্রোটেকটেড হয়ে বিনতা দেয়ান ফিরে এসে সুধীরবাবুকে বললেন, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, মিস্টার

কুশারী। সত্যি আপনি আজ আমার পরম বন্ধুর কাজ করেছেন। সত্যি লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সেই কবে যেন—কার লেখা—ঠিক মনে নেই—'ফরগেটিং' নিবন্ধ পড়েছিলাম। সেখানে লেখক মানুষেব ভুলে যাবার একটা বিরাট তালিকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমারটা বোধ হয় সব্বাইকে ছাপিয়ে গেল। কী বলেন, মিঃ কুশারী?

—ইয়েস, মিসেস দেয়ান। আফটার অল মেন আর আন্ডার দ্য ডুরেস অফ ফরগেটিং। ওয়ান গেটস্ এ্যাণ্ড দ্য আদার ফরগেটস্। সো সেয়স্ দি এ্যাডেজ।

—খুব সুন্দর কথা বলেছেন।

—আচ্ছা উঠি, বিনতা দেবী।

—না না! সে কি! বসুন, একটু কফি খেয়ে যান।

বেয়ারাকে কফিব আদেশ দিয়ে বিনতা দেবা আবার কুশারীবাবুর সঙ্গে আলাপ কবতে লাগলেন। বেয়াবা দু'জনকে কফিব পেয়ালা এগিয়ে দেবার পব কফি খেতে খেতে বিনতা দেবী বললেন, আচ্ছা কুশারীবাবু, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?

—আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই।

—সে কি!

—বাড়িতে শুধু আমি আর আমার স্ত্রী কমলা।

—নামটা খুবই সেকেলে সেকেলে—তাই না?

—শুধু নাম নয় মানুষটাও একেবারেই সেকেলে।

—সেকি? একেবারেই সেকেলে!

—একদম তাই। আচ্ছা অনেকক্ষণ হল এসেছি—এবার নিজের টেবিলে যাই।

'আসুন' বলে বিনতা দেবী কৃতজ্ঞতাসূচক দৃষ্টিতে সুধীরবাবুর দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন এবং সুধীরবাবু নিজের আসন গ্রহণ করার পরই তার চোখের পাতায় পলক পড়ল।

ফাইল বগলে করে এই যে কুশারীবাবুর বিনতা দেবীর ওখানে যাওয়া

এবং এতক্ষণ গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করা একথা দাবানলের মতো অফিসের এ-টেবিল সে-টেবিল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

কুশারীবাবু ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতেই তার চেয়ারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সহকর্মীদের নানা টিপ্পনী তার কানে এল। মাঝবয়সী বোসবাবু বললেন, মিস্টার কুশারী, আপনাকে ধন্যবাদ। মশায়, আমরা বিপ্লবী পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন করি। কিন্তু একাজ করতে বোধ হয় আমাদেরও বেগ পেতে হত। ওয়েল ডান, মিঃ কুশারী, ওয়েল ডান!

চক্কোত্তি মশাই হেসে লুটোপুটি খেয়ে বললেন, আরে মশয়! আপনাব তো ছাখতে আছি এ্যাক্কেবারে হকুনের চোখ! কুথায় ভাড়ার পইর্‌য়া থাকে, ঠিক আপনার নজরে আছে!

কিছু কিছু উঠতি চ্যাংড়া ছোকরা হু'জনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গানের কলি আউড়াতে লাগল, 'গোলে মালে গোলে মালে পিরিত করো না' কিম্বা 'মন যে আমার কেমন কেমন করে, হায়রে'…

সুধীরবাবু আর বিনতা দেবীকে নিয়ে এই রসালো আলোচনা শুধু অফিসের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। তার ঢেউ বাড়িতে এসে পড়ল শেষ পর্যন্ত। সুধীরবাবুর সমসাময়িক মিঃ মুখার্জী সেদিন তার বাড়ি এসে হাজির। সেদিন ছিল বোববার। তাই সকাল সকাল সুধীরবাবু বাজারে গিয়েছেন তার মেদবহুল গিন্নীর চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় জোগাড় করতে। সেই ফাঁকে চা খেতে খেতে মিঃ মুখার্জী ঘটনাটি বেশ রং চং মাখিয়ে মিসেস কুশারীর চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়'র মতোই পরিবেশন করলেন।

বাজার থেকে ফিরে কুশারীবাবু 'থলে হু'টো ধরো তো' বলে দম নিতে নিতে বললেন, 'বাজার তো নয় যেন আগুন—কোনো কিছুতে হাত দেবার উপায় নেই!'

গিন্নীর মুখোমুখি হতেই তিনি গরম বাজার থেকে ফিরে এসে একেবারে গিন্নীর গরম কড়াইতে পড়লেন। গিন্নীর রণং দেহি চিৎকার, বুড়ো ভাম, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। লজ্জা নেই, ঘেন্না

নেই, শেষে কিনা অন্য মেয়েমানুষের দিকে নজর…।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুধীরবাবু এই ব্লিৎসক্রিগ আক্রমণে একেবারে দিশাহারা। কিন্তু তিনি সহজভাবেই তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি, কী হয়েছে ?

—কী হয়েছে! তুমি কিছু জানো না ? ন্যাকা! বলি এই বয়সে মেয়েদের পাছার দিকে নজর! আজ বাদে কাল মরতে চলেছে—তবু মিনসের ঢ্যামনামো গেল না ?

মস্করাটা যে এই পর্যায়ে পৌঁছবে মিঃ মুখার্জী সেটা ভাবতে পারেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি মিঃ কুশারীর হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে বসিয়ে তার মিসেসকে বললেন—মিসেস কুশারী, এভাবে চ্যাঁচামেচি করবেন না! ব্যাপারটা তো, বুঝতেই পারছেন, খুব ডেলিকেট! লোক জানাজানি হওয়া ঠিক নয়।

নিজের স্বামীর মতো মিঃ মুখার্জীকে এক ধমক দিয়ে বসিয়ে মুখে খই ফুটিয়ে তিনি ফের বলতে লাগলেন, মেয়ের বয়সী মেয়েদের দিকে নজর—তাও আবার ও-রকম জায়গায়! বলি মরণ হয় না! গলায় দড়ি জোটে না!

—তুমি ভুল শুনেছ—তুমি ভুল বুঝেছ! ব্যাপারটা হল—

—রাখো তোমার বুকনি। অফিসের এ্যাতো এ্যাতো লোক থাকতে কারো নজরে পড়ল না, আর নজরে পড়ল কিনা এই মিনসের চোখে। ও মাগীকেও বলিহারি যাই। বলি রক্তের ঢল বয়ে গেল গা, তবু কোনো হুঁস নেই!

মাথা নিচুকরা স্বামীর দিকে আঙুল বাগিয়ে ফের তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন মিসেস কুশারী, বুড়ো ভাম, এই বয়সে…ছি ছি ছি! আবার গদগদ হয়ে তার হাতের কফি খাওয়া হয়েছে। কে জানে কফির সঙ্গে কিছু মিশিয়ে-টিশিয়ে দিয়েছে কি না! আফিসের মাগীদের তো কোনো বিশ্বাস নেই। ও মাগীতো শুনছি আবার মাঝ বয়সেই ভাতারখাকী।

মিঃ মুখার্জী বললেন, মিসেস কুশারী, চুপ করুন প্লীজ, চুপ করুন। এসব কথা…।

পুনরায় ধমকের সুরে তাকে বসিয়ে দিলেন মিসেস কুশারী, আপনি চুপ করুন! তারপর মিঃ দেয়ানকে উদ্দেশ্য করে ফের বিস্ফোরণ শুরু হল, আজকাল তো শুনেছি অনেক কিছুই নাকি ওষুধ-বিষুধ করে বন্ধ করা যায়। তো এটা বন্ধ হয়, সেটা বন্ধ হয়, আর ও মাগীর ওটা বন্ধ হয় না!

খুনকরা আসামীর মতো মুখ বুজে সব কিছু হজম করলেন সুধীরবাবু। একটি কথারও তিনি জবাব দিলেন না। কারণ তিনি জানেন একটি কথার জবাব দেওয়া মানে হাজার কুকথা ডেকে আনা। আর তার প্রত্যেক কথায় এমন বিষ যে তা বিষধর কেউটে সাপকেও হার মানায়।

বাড়ির এই বিষময় অবস্থার কথা অফিসে বিনতা দেবীর কানে এল। তার অনুতপ্ত মন কুশারীবাবুর কথা ভেবে চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাবছিলেন একদিন কুশারীবাবুর বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু তার দজ্জাল বউয়ের কথা শুনে সেদিকে যেতে আর সাহস পাননি।

সেদিন অফিস ছুটির পর কেন যেন তার মনে হল যে কুশারীবাবুকে সান্ত্বনা দেওয়া তার কর্তব্য। তাই ছুটির পরই তিনি ছুটলেন তার পিছু পিছু। চলনে-বলনে তার ভয়হীন সাবলিল গতি। সমস্ত কুৎসা সমস্ত রটনা যেন এক মুহূর্তে তার পায়ের তলায় পিষ্ট হতে লাগল।

ফুটপাথ দিয়ে যেতে যেতে তিনি সুধীরবাবুকে বললেন, মিঃ কুশারী, আমার জন্যই আপনার এই বিড়ম্বনা!

—না ঠিক তা নয়, আসল কথাটা কি জানেন—আমার স্ত্রী খুব 'মুখরা'। একটুকুতেই তুলকালাম কাণ্ড করে বসে।

—তবুও আমার জন্যই তো শুধু শুধু আপনি…

—ওতো আমার রোজকার ব্যাপার। ওতে আপনি কিছু মনে

করবেন না। আপনাকে বলেছিলাম না—আমার স্ত্রীর শুধু নাম নয়, তাব সবকিছুই একেবারে সেকেলে!

অফিসের পরে বিনতা দেবী এবং সুধীববাবুর এই যে পাশাপাশি চলা প্রাণ খুলে দু'টো কথা বলা সেটাও অফিসের আর এক শেয়াল পণ্ডিত চক্কোত্তি মশাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পরদিন পৌঁছে দিলেন কুশারী গিন্নীর কানে।

ব্যস আর যায় কোথায়। কুশারীবাবু বাড়ি ফিরতেই অগ্ন্যুদ্গার শুরু হল, ঢ্যামনা মিনসে কোথাকার! যমের অরুচি! দু'জনে হাত-ধরাধরি করে একেবারে সদর রাস্তায় সবার চোখের সামনে বেলেল্লামি করা!

—কী সব বাজে কথা বলছো? কে তোমাকে বলেছে এ সব? শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলে একজনেব নামে দোষ দেওয়া!

—ওরে আমার ক্যাঁটাল! ওর সম্বন্ধে কিছু বলতেই একেবারে গায়ে ঠোসা পড়ে গেল! আফিসের মাগীরা শুনেছি তুকতাক জানে। তা এ্যাতো শত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত এই মিনসের ঘাড়ে এই পেত্নী এসে ভর করল! হায় হায় হায়! আমার কি হবে গো!

বাড়ির ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় অতিষ্ঠ হয়ে সুধীরবাবু ঘব থেকে বেরিয়ে সাময়িকভাবে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন ফুটপাথে গাড়িবারান্দার নিচে ভবঘুরেদের দল সংসার পেতেছে পাতার ছাউনি দিয়ে। তাদের জীবনে কত দুঃখ কত কষ্ট। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হল, ওরাও তার চাইতে অনেক সুখী!

সেদিন হাফ ছুটির দিন। বিনতা দেবীর মনটা ভালো নেই। তাই ছুটির পর কুশারীবাবুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতে চাইলেন। ঘরের তাপ উত্তাপে কুশারীবাবুর মনও বিষিয়ে ছিল। তাই বিনতা দেবীর প্রস্তাবে তিনিও কোনো আপত্তি করলেন না।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সামনেই একটা বিরাট পামগাছ। কত দিনের সেই গাছ কেউ জানে

না। তাকে আশ্রয় করে বেয়ে উঠেছে একটি স্বর্ণলতা—উপরে আরো উপরে—যেন দু'হাতে আকাশ ছোঁবে।

গঙ্গার ধারের একটি বেঞ্চির উপর এসে বসে পড়লেন সুধীর কুশারী। আস্তে আস্তে বিনতাদেবীও এসে বসলেন তার পাশে। দু'জনেরই দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সামনে প্রশস্ত গঙ্গার দেহটা উদল হয়ে পড়ে আছে। মাঝখানে নোঙরবাঁধা বয়া মাথা নেড়ে শুধু হেলছে-দুলছে। বহুদিন ব্যবহার না-হওয়া চড়াপড়া বয়াটার উপর জন্মেছে ছোট ছোট ঘাস। মাস্তুলের মতন আংটা থেকে নিচ পর্যন্ত একটা চির গঙ্গার জানুর দিকে লুটিয়ে পড়েছে। অস্ত সূর্যের চিকিমিকি আলোয় কাঁচা হলুদের রঙ উথলে পড়েছে গঙ্গার সমস্ত দেহে। আর ঠিক মাঝখানে লাল টকটকে রঙ ধারণ করেছে বয়ার নিচটা! তার আকর্ষণে জোয়ারের উথাল-পাথাল স্রোতের সঙ্গে ভাঁটার ভিতর স্রোতের এক সহজ মিলন। এই মিলন-স্রোত বয়ে চলেছে মোহনার দিকে জীবন-তরঙ্গ উদ্বেলিত মহাসাগরের বজ্রনির্ঘোষ স্পন্দনে।

মনে মনে

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ কিম্বা সংক্ষেপে বিবাদী বাগের নিকট ডাক-তার দপ্তরেব প্রধান কার্যালয় চিঠি-বিভাজন শাখায় কাজ করেন। তাকে রোজ তাই লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে দমদম থেকে শিয়ালদা হয়ে বিবাদী বাগ যেতে হয় ১৪ নং ট্রাম ধরে। বয়স হয়েছে—অবসর নিতে আর বছর তিনেক বাকি। তাই বাসের ধকল আর সহ্য হয় না। সংসার বলতে তার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে হালফিল বিয়ে করে চলে গেছে বিহারের সকড়িগলি যেখানে সে একটা ছোটখাটো প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। তাই মেয়েকে নিয়ে একাই দমদমের এক বস্তি বাড়িতে বাস করেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। তার স্ত্রী বছর দুই হল গত হয়েছেন।

শিয়ালদা স্টেশনে নেমে জগদীশ বসু রোড হয়ে তাকে ট্রাম ধরতে হয় প্রতিদিন। কিন্তু রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। একদিকে হকার আর অন্যদিকে দোকানদারদের ফুটপাথ দখলের যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। একজন এক ফুট দখল করে তো আর একজন দু'ফুট দখল করতে এগিয়ে আসে। তারপর পৌরপিতাদের কর্মযজ্ঞ যদি শুরু হয় তবে তো কথাই নেই। কাজ শেষ হয়ে গেলে রাস্তা মেরামতির কাজটি ভুলে যায় সবাই। ভাবখানা এই যে বাকি কাজগুলো যেন স্বয়ং পথচারীদের। উপরন্তু মস্তানদের করুণায় যেখানে-সেখানে হকার বসানো, এলাকাভিত্তিক তোলা নেয়া একেবারে রোজকার ব্যাপার যাকে বলে রুটিন ওয়ার্ক। সত্যি কথা বলতে কি শহর জীবনের নিগ্রহপুরাণে কলকাতার পথচারীরা অহরহ নিপীড়িত প্রতিপদে নিষ্পেষিত। তবু বাঁচার তাগিদে এই শহরের অধিবাসীদের আপ্রাণ প্রয়াস দেখে মনে হয় তারা যেন মৃত্যুকে জয় করে বসে আছে সবাই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সেদিন ট্রেন থেকে নেমে কাইজার লেন হয়ে জগদীশ বসু রোড ধরে শ্যামবাজারের দিকে মুখ বরাবর এগিয়ে চলেছেন ফার্নিচার দোকানের একেবারে গা ঘেসে। রাজাবাজারের ট্রাম ডিপো থেকেই সাধারণত ট্রামের বামদিকের একক আসনে বসে তিনি রোজ যাতায়াত করেন। যাতায়াতে তার এই অতিসতর্কতা জেনে অফিসের এক উঠতি আঁতেল ছোকরা বলেছিল, মৃত্যুঞ্জয়দা জীবনকে খুব ভালোবাসেন—জীবনভর বাঁচতে চান—তাই কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। তারপর হালফিল শ্লোগানের সূত্র ধরে সেও বলে উঠেছিল, মরতে চাই না, বাঁচতে চাই—বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। তার কথা শুনে অফিসশুদ্ধ লোক সেদিন হো হো করে হেসে উঠেছিল।

ফার্নিচার দোকানগুলো যেখানে শেষ হয়েছে এবং যেখানে মৃৎ-শিল্পীদের প্রতিমা গড়ার কারখানা রয়েছে, সেইখানে হালফিল মড়ার খাটের ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে বেকার ছেলেরা। খাট বলে খাট—যেন মড়ার খাটের মেলা বসে গেছে সেখানে। খাটগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখলেই হয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। সবজি বিক্রেতাদের তরিতরকারীর মতো অসংখ্য খাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তাময় করে রেখে দিয়েছে একেবারে কাশিমবাজার কুঠি অব্দি। আরে বাবা শেয়ালদার কাছাকাছি মাত্র তো দু'টি হাসপাতাল—এক নীলরতন সরকার আর এক বি. আর. সিং। তবে এত সব মড়া আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া বেকারের দল কি জানে না যে এখন মানুষের আয়ু অনেক বেড়ে গেছে।

বাড়ি থেকে বেরোতে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সেদিন দেরী হয়ে গেছে। তাই অফিস যেতেও তার দেরী হয়ে যাচ্ছিল। হন্তদন্ত হয়ে তিনি ছুটছেন ট্রাম ধরবার জন্য। সামনেই প্রতিমা গড়ার কারখানা। তার কাছেই বটগাছের গোড়ায় শিবমূর্তি। তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে রোজকার মতো প্রণাম সেরে নিচ্ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। তাড়াতাড়ি চোখ খুলতেই দেখেন ১৪নং ট্রাম তীরবেগে ছুটে আসছে তার দিকে।

প্রণাম সারার পর কানমলা-নাকমলা খাওয়ার আর সময় হল না। তীব্রবেগে তিনিও ছুটলেন আগুয়ান ট্রামটি ধরতে। তড়িঘড়ি যাওয়ার সময় তার ঝুলন্ত পাঞ্জাবির একটি পকেট আটকে গেল মড়ার খাটের এক কোণে। আটকে যেতেই হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বুকের ভিতর ছ্যাৎ করে উঠল। ধড়ফড় করতে লাগল তার সমস্ত শরীর। অজানা আতঙ্কে মাঘ মাসের সকালেও দরদর করে ঘামতে লাগলেন তিনি। নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত বয়ে চলতে লাগল ১০৫° জ্বরের মতো। মাথাটা তার ঝিমঝিম করে উঠল। শিরদাঁড়া থেকে একটা হিমেল প্রবাহ আচ্ছন্ন করে ফেলল সমস্ত মস্তিষ্ক। চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন তিনি। কিছুটা সম্বিত ফিরতে বটগাছের তলায় দেখলেন কুমোরদের গড়া সারি সারি কালীমূর্তি। ছোট ছোট কাঠের মঞ্চের উপর নগ্ন-শিবের বুকের উপর নগ্নকালী জিব বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূর্তিগুলোয় এখনো রং-চং হয়নি। এমনকি করা হয়নি কোনো আবরণ আভরণও।

দরদর করে শরীর ঘামছে, বুকের ভিতর কেমন ধড়ফড় করছে, ঝিমঝিম করে মাথাটা কেমন ঘুরছে। এই অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়বাবু অফিস যাওয়া বন্ধ করে সেদিন বাড়ি ফিরবেন স্থির করলেন। অনেকটা সময় বিশ্রাম নেওয়ার পর তিনি কাইজার লেন এড়িয়ে—কারণ তাহলে আবার আর. এম এস. অফিস সংলগ্ন বিশাল ওভারব্রিজ পেরোতে হয়—একই ফুটপাথ ধরে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে ২নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ডানকুনি লোকালের জানলার ধারে বসে পড়লেন বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। মাথাটা বসার আসনে হেলান দিয়ে একটু আরাম বোধ করছিলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। এমন সময় চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠল তার স্ত্রীর মৃত্যু-দৃশ্য।

মায়াদেবী সেদিন স্বামীর অফিস যাবার আগে রান্নাবান্না করছিলেন। হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—ওগো আমার বুকটা কেমন যেন ব্যথা করছে, জ্বালা জ্বালা করছে, ধড়ফড় করছে! তুমি আমার

কাছে এসো। মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্ত্রীর কাছে গিয়ে পাঁজাকোলে করে তাকে জ্বলন্ত উনুনের কাছ থেকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর মেয়েকে বললেন, শীগ্‌গির এদিকে আয়। তোর মা'র কাছে একটু বোস্—আমি চট করে ডাক্তার ডেকে আনি। তড়িঘড়ি গেঞ্জিটা পরে চটি পায়েই বেরিয়ে পড়লেন ডাক্তারের খোঁজে। চোখে-মুখে তার ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা। ইভা তার মা'র বুকে হাত বুলোতে বুলোতে আর বাম হাতে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে বলল—মা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? জল খাবে? মায়াদেবী মেয়ের কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। ইশারায় শুধু নিজের ডান হাত বুক-মালিশ-করার মতো করে বারবার উপর-নিচ করতে লাগলেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। অনেক সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর মায়াদেবীকে হাসপাতালে পাঠাবার কথা বললেন ডাক্তার বৈদ্য। তিনি বললেন, ইট ইজ এ কেস অফ্‌ ম্যাসিভ্‌ হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তারবাবুর কথা শুনে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ঘাবড়ে গেলেন। ইভা কান্নায় ভেঙে পড়ল, মায়াদেবীর চোখ দিয়ে জল পড়ল গড়িয়ে। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ পালন করতেই হবে। ইতিমধ্যে পাড়ার লোকজনও কিছু জড়ো হয়ে গিয়েছিল। তাদের সাহায্যে বড় রাস্তা থেকে একটি ট্যাক্সি এনে মায়াদেবীকে ভর্তি করা হল নীলরতন হাসপাতালে। ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে বড় ডাক্তারের নির্দেশে তাকে নিয়ে যাওয়া হল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। রোগীর নিতান্ত আপনজন ছাড়া সেখানে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। মৃত্যুঞ্জয়বাবু দেখলেন তার স্ত্রীকে যেখানে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ঠিক তার মাথার কাছেই রয়েছে একটা ই. সি. জি. যন্ত্র। তিনি লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ একটি গ্রাফের মাধ্যমে ডানদিক থেকে অবিরাম বামদিকে সরে সরে যাচ্ছে সেই যন্ত্রে। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে দেখা উঁচু পাহাড়ের চূড়োগুলো যেন মালভূমিতে নেমে নেমে আবার ফের উঠে উঠে যাচ্ছে অনবরত একই সরল রেখার উপর। বেলা দশটার

সময় মায়াদেবীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল আর তার মৃত্যু হল বিকেল পাঁচটায়।

মায়াদেবীর সেই ই. সি. জি. গ্রাফের রেখাগুলি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মনে হতেই ভয়ে তার মন শিউরে উঠল। তিনি ভাবলেন স্ত্রীর মতো তারও বোধহয় ম্যাসিভ্ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সেই ছবি মনে করতেই তার বুক ধড়ফড় বেড়ে গেল এবং দরদর করে ঘামতে লাগলেন তিনি। ততক্ষণে ডানকুনি লোকাল ছেড়ে দিয়েছে স্টেশন থেকে।

জানালার কাছে মাথা রেখে এক ফুসফুস দম নিয়ে হৃদযন্ত্রটাকে চাঙ্গা করেত চাইলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। কিন্তু কী আশ্চর্য সেই মড়ার খাটের কথাই মনে পড়তে লাগল বারবার তার মনে। উপরন্তু খাটটি আবার ছিল বেশ পুরোনো। তারপর যে-দিকটা তার জামার পকেট আটকে গিয়েছিল, সে-দিকটা কেমন যেন একটা দাগলাগা অবস্থায় ছিল সেই খাটে। মোট কথা কোনোমতেই সেটাকে নতুন খাট বলে মনে করা যায় না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু শুনেছিলেন যে, এইসব খাট শ্মশানে মরদেহ বহন করার পর ডোমেদের হাত ঘুরে প্রায় নাই-দামে আবার খাটের মালিকের কাছে ফিরে আসে। জগদীশ বসুর বিজ্ঞানভিত্তিক সেই 'ভাগিরথীর উৎস সন্ধানে' গল্পের মতন—'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? মহাদেবের জটা হইতে।' হাসপাতালে নাকি এরকম আকছার হয়—এক মড়ার বালিশ আর এক রুগী মাথায় দিয়ে রাত কাটায়। সেই দাগী খাটে শুইয়ে কোনো এক বীভৎস মড়াকে বয়ে নিয়ে গেছে, এই চিন্তা মনে আসতেই মৃত্যুঞ্জয়বাবু একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়লেন। মনকে তিনি কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছেন না। শেষে ট্রেন থেকে নেমে রিক্সা করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন তিনি।

বাবাকে অসময়ে বাড়ি ফিরতে দেখে ইভা বিস্ময়ে অবাক। সে বলল, বাবা, তুমি এমন সময় বাড়ি ফিরে এলে? শরীর-টরীর তোমার

খারাপ হয়নি তো ?

—না না ! ঠিক শরীর খারাপ নয় ! তবে ভালো লাগছিল না মা, তাই নিজেই বাড়ি ফিরে এলাম।

—ঠিক আছে, তুমি বিছানায় শুয়ে পড়—আমি পাখাটা খুলে দিচ্ছি।

—ইভা শোন্ ! র‍্যাক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'টা একবার দে তো, মা !

—দিচ্ছি, বাবা ! এই কথা বলে ভাঙাচোরা একদিকে কাৎ-হওয়া কাঠের তাক থেকে 'সঞ্চয়িতা' তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে ইভা নিজের কাজে চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' খুলে আচম্বিতে প্রথম কবিতা দেখেই মৃত্যুঞ্জয়বাবু একেবারে হতভম্ব—

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পরিবে নয়ন পরে অন্তিম নিমেষ।

নশ্বর দেহের অনিত্যতা মহাকবি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন দু'টি ছত্রে। জীবনের অনিবার্য পরিণতি লক্ষ্য করে এক মৃত্যু-শীতলতা অনুভব করলেন তিনি মনে মনে। তাই সেই বিশাল কাব্যগ্রন্থের অন্য পাতা তড়িঘড়ি খুলতে উদ্যত হলেন তিনি। সেখানেও মৃত্যুঞ্জয়বাবু দেখতে পেলেন—

সমুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।

আজকের সবকিছু ঘটনার সঙ্গে মৃত্যুগন্ধ কেন লেগে আছে সেটা মৃত্যুঞ্জয়বাবু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। তার মনের গোলক-ধাঁধায় মৃত্যুরহস্য বারবার শুধু ঘোরাফেরা করতে লাগল। সেইসঙ্গে তার জীবনের কতগুলি অস্বাভাবিক আচরণের কথা মনে পড়ে গেল তার।

বিয়ে করতে যাবার সময় ট্যাক্সিতে রজনীগন্ধার স্টিক তার অসহ্য

লেগেছিল। একথা ফুলশয্যার রাতে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন মায়াদেবীকে। এবং তার কথামতো ফুলশয্যা-ঘরে খাটের চারকোণে রাখা রজনীগন্ধার চারটি গুচ্ছকে সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল সেই মধুরাতে। মনে মনে মায়াদেবী সেদিন নিশ্চয় বলেছিলেন—কার পাল্লায় পড়লুম রে বাবা।

পরবর্তীকালে এই নিয়ে হাসিচ্ছলে অনেকবার অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়বাবু সব সময়ই বলেছেন—তার খাটে রজনীগন্ধার ফুল থাকলে তার মনে হয় যেন সবাই মিলে তাকে কাঁধে নিয়ে 'বোল হরি হরি বোল' করতে করতে একেবারে শ্মশানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মা'র মুখে এই কথা শুনে ইভা শুধু তার মাকে বলেছিল—বাবার যত সব কাণ্ড।

নানা চিন্তাভাবনায় রাতের খাওয়া শেষ করে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ঘুমুতে গেলেন সকাল সকাল। কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন আর মাঝে মাঝে হাই তুলে সেই হাই বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন ডান হাতে তুড়ি দিয়ে। এমনি করে কখন যে চোখের পাতা বুজে এসেছে, তার মনে নেই। আধজাগা আধ ঘুমে মাঝরাতে এক দীর্ঘ স্বপ্ন দেখলেন তিনি। বহুদিন আগে দেখা বার্গম্যান-এর 'ওয়াইল্ড ব্ল্যাক স্ট্রবেরি' ছবির কতগুলো দৃশ্য একে একে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। মৃত্যুভয়ে ভীত আশি বছরের এক বৃদ্ধ হাতে লাঠি ভর করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন ডানদিক ফুটপাথ ধরে। হঠাৎ রাস্তার উপর কাঁটাশূন্য এক ঝুলন্ত ঘড়ি তার নজরে পড়ল। একটা অশুভ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তিনি মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয়ই তার সামনে অপেক্ষা করছে এক চরম মুহূর্ত। এই ভেবে বৃদ্ধের মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। গুটিগুটি পায়ে এগুতেই তিনি দেখতে পেলেন শ্বেত পাথরের ধপধপে এক মসৃণ প্রশস্ত রাস্তা। সেই রাস্তার উপর এসে পড়েছে দুধারের লিনড্রেন গাছের ঘন কালো ছায়া। অবাক বিস্ময়ে বৃদ্ধ অনুভব করলেন কোনো এক অজানা-

অচেনা-ভবিষ্যৎ-মৃত্যু-শীতলতা। কিছুদূরে এগোতেই রাস্তাটি যেখানে বামদিকে ঢালু পথে নিচে নেমে গেছে, সেইদিক থেকে উঁকি দিয়ে উঠে এল ঘনকালো এক টমটম গাড়ি যাকে টেনে নিয়ে আসছে একজোড়া ঘনকালো ঘোড়া। কী আশ্চর্য, সেই টমটম গাড়িটি এসে দাঁড়াল সেই বৃদ্ধের সামনে। গাড়ির দরজা আপনি খুলে যেতেই একটা সাদা কফিন সেই নির্জন রাস্তার উপর এসে পড়ল। বৃদ্ধের হাত থেকে তার লাঠি পড়ে গেল বিস্মিত আতঙ্কে। আর সেই কফিনের মুখ খুলে যেতেই তার ভিতরের মরদেহ দু'হাত বাড়িয়ে সেই বৃদ্ধের হাত চেপে ধরে তাকে কফিনের ভিতর প্রবেশ করতে আহ্বান করল। মৃত্যুভয়ে ভীত সেই বৃদ্ধ তার হাত ছিনিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বারবার মাথা নেড়ে কফিনে প্রবেশ করতে তার অসম্মতির কথা তিনি ব্যাকুলভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন কফিনে শোয়ানো সেই মরদেহকে।

ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু-ভয়ে-ভীত মৃত্যুঞ্জয়বাবু মাঘ মাসে ঘেমে নেয়ে একেবারে বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন—না-আ-আ-আ! না-আ-আ-আ!

চিৎকার শুনে পাশের ঘরে থেকে ইভা তাড়াতাড়ি ছুটে এল সেই ঘরে। বাবাকে বার দুই ঝাকুনি দিয়ে সে বলে উঠল, বাবা, কী হয়েছে? কী হয়েছে? বল, কী হয়েছে?

—আ— —কি— —না কিছু না?

—তুমি 'না না' করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

—ও কিছু না! একটা স্বপ্ন দেখেছি! একটু জল দে তো, মা!

—দিচ্ছি, বাবা।

কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ভরে বাবার হাতে তুলে দিল ইভা। মেয়ের হাত থেকে গেলাস নিয়ে এক নিমেষে পান করে ফেললেন সমস্তটা জল। তারপর ঘামে-ভেজা গেঞ্জি খুলে মেয়েকে শুতে যেতে বললেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। ইভা চলে যাবার পর ডিম লাইটের আবছা

আলোয় স্ত্রীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললেন—মায়া, তুমি চলে যাবার সময় বলেছিলে—ইভাকে দেখো গো—ইভাকে দেখো। সেদিন শোকে দুঃখে তোমায় কথা দিতে পারিনি। আজ কথা দিচ্ছি মায়া, ওকে আমি দেখবো। ওর জন্যই আমি বাঁচবো।

ক্ষণিকের মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। দূরে বাগজোলা খাল পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে এশিয়ার বৃহত্তম বেতার কেন্দ্রের বিশাল চত্বর। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বয়ে আনা নতুন নতুন সংবাদে বহু বছরের শীর্ণ থামগুলো যেন ফের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তাই তাদের লাল লাল চোখ দূর দিগন্তের রেখা ভেদ করে আরো সুদূরের পানে চেয়ে আছে নতুনের খোঁজে।

রাত প্রায় ভোর হয়ে আসছে। উষার আলো পূবদিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। শীতের ক্ষণিক কুয়াশা এখন দূরে সরে গেছে এবং সেটা ভেদ করে উথলে পড়ছে একরাশ আলোর ঝলক। ভোরের বাতাসে পাখির কূজনে পৃথিবীর কলধ্বনি আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে। সেই আলো ভেদ করে সেই রেশ প্রাণে বয়ে কীর্তনআঙ্গিক এক মাঙ্গলিকী সুর কম্বুবিস্বরবে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল—'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান।'

পায়ে পায়ে গাড়োয়াল

হিমালয় ভ্রমণের কথা উঠলেই আগেকার দিনে মানুষের বুক দুরু দুরু করে উঠত এক অজানা অচেনা ভয়ে। এমনকি হিমালয় যাত্রার আগে চোখের জলে সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর রীতিও ছিল সেই সময়। কিন্তু বর্তমান কালে—এই বিজ্ঞানের যুগে—ভারতের যে কোনো প্রান্ত থেকে ট্রেনপথে ঋষিকেশ হয়ে চুক্তিবদ্ধ ভ্রমণ এজেন্সি বা সরকারি বাস অথবা ট্যাক্সিতে করে হিমালয়ের যে কোনো দুর্গম স্থানে পৌঁছনো একেবারে জলভাত।

আমরাও ট্রেনপথে হাওড়া থেকে হরিদ্বার হয়ে ঋষিকেশ পৌঁছলাম ৪ঠা সেপ্টেম্বর '৪৪ বেলা দশটা নাগাদ। আমরা—অর্থাৎ আমি, আমার স্ত্রী সাবিত্রী এবং দুই মেয়ে সোমা ও সীমা। তাছাড়া বিধবা যুবতী দেবী, তার ছেলে টুটু ও মেয়ে লীনা আর রমেন নামে আর একটি যুবক ছিল আমাদের সহযাত্রী।

ঋষিকেশ পৌঁছে কালিকমলীওয়ালা ধর্মশালায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে আমি আর রমেন বাস-আরক্ষণ কেন্দ্রে হাজির হলাম গঙ্গোত্রীর টিকিট কাটতে। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় হঠাৎ কানে এল বারো এবং তেরই সেপ্টেম্বর পরপর দু'দিন চাক্কা জ্যাম অর্থাৎ গাড়োয়াল বন্‌ধ। আমাদের ঠাসা ভ্রমণসূচীর মধ্যে দু'দিন তো দূরের কথা সিকি দিনও যোগ করার কোনো উপায় ছিল না।

কাজেই লাইন থেকে বেরিয়ে রমেনকে বললাম, গাড়ি ছাড়া চারধাম দেখার কোনো রাস্তা নেই। আমার কথায় সায় দিয়ে একটি রিক্সা করে চুক্তিবদ্ধ এক ভ্রমণ-ব্যাপারীর দরজায় সরাসরি হাজির হলাম মুশকিল আসান করার জন্য। আর সময় অভাবে চার ধামের এক ধাম অর্থাৎ যমুনোত্রী বাদ দিয়ে গঙ্গোত্রী-গোমুখ, কেদার এবং বদ্রী এই তিন ধাম

দেখার উদ্দেশ্যে মাথাপিছু ৩৮০ টাকা হিসাবে ঠিক করা হল দুটো অ্যামবাসেডর।

৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা নাগাদ আমরা মালপত্রসহ ঋষিকেশ থেকে যাত্রা শুরু করলাম গঙ্গোত্রীর পথে। পথে বৃষ্টি, ধ্বস ইত্যাদি মামুলি বাধা অতিক্রম করে বিকেল নাগাদ আমরা পৌঁছলাম উত্তর কাশী। সেখানে কালিকমলীওয়ালা ধর্মশালায় আমাদের স্থান হয়ে গেল সহজেই। যাত্রীসংখ্যা বেশি ছিল না। তাই ধর্মশালায় স্থান পেতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

গর্জনমুখর ভাগিরথীর তীরে এই ধর্মশালা থেকে সবুজ বনানীঘেরা পরিব্যাপ্ত হিমালয়ের দৃশ্য অতি মনোরম। ঋষিকেশের মতো এখানেও আমাদের সবার খাবার ব্যবস্থা করল দেবীই। বস্তুত ভ্রমণকালীন খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব প্রায় পুরোটাই ন্যস্ত ছিল দেবীর উপর। তাকে সাহায্য করার জন্য অবশ্য ছিল অন্যরা।

৬ই সেপ্টেম্বর ভোর চারটেয় রওনা দিয়ে আমরা গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম বেলা দশটায়। কোনোক্রমে খাওয়া দাওয়া সেরে মালপত্র জমা দিয়ে আমরা বেলা ১১টা নাগাদ গোমুখের দিকে রওনা হলাম। গঙ্গোত্রী থেকে ২০ কিমি দূরে গোমুখের পথ বড়ো দুর্গম। আমাদের গাইড ছিল সোহন সিং। আমাদের অতি প্রয়োজনীয় মালপত্র পিঠে বয়ে নিয়ে হেলতে দুলতে সবাইকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সেই পাহাড়ী লোকটি।

কথা ছিল আমার ছোট মেয়ে সীমাকেও মাঝে মাঝে সে বয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার পাঁচ বছরের মেয়ে তার বিস্ময়কর সাহস ও উদ্যম দেখিয়ে আমাদের সবাইকে চমক লাগিয়ে দিল। চড়াই উৎরাই বেয়ে পায়ে হেঁটে সে নির্বিবাদে এগিয়ে চলল গোমুখগামী সেই দুর্গম পথ। পথ চলতে চলতে আমাদের যেখানে প্রাণান্তকর অবস্থা, সেখানে মাঝে মাঝে তার টিপ্পনিসুলভ 'অসহ্য, গাজ্বালা করে' এরূপ দু'একটি মন্তব্য ছাড়া আর বিশেষ কোনো অনুযোগ ছিল না।

প্রাণান্তকর অবস্থার আর একটা কারণ আমাদের গোড়ায় গলদ। যাত্রার প্রাক্কালে লাঠি না নিয়েই আমরা খালি হাতে পথ চলছিলাম। 'অন্ধের যষ্টি' প্রবচনটির মর্মকথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম আমরা। দেবীব অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ায় তার ছেলে পাইন গাছের একটা শুকনো ডাল যোগাড় করে সে-যাত্রা সামাল দিল তার মাকে।

এইভাবে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন অবস্থায় আমরা শেষ পর্যন্ত ভূজবাসা এসে পৌঁছলাম সূর্য ডোবার আগেই। সেখানে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল লালবাবার আশ্রমে। দু'খানা পোড়া রুটি মুখে দিয়ে শীতে ঠকঠক করতে করতে আমরা লালবাবার ডেরায় সুখ নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম অনাদি অনন্ত কালেব ব্যবহৃত আশ্রমের নোংরা ধূলট কম্বলেব নিচে।

কথায় বলে, দশের লাঠি একের বোঝা। আমাদের সবার অতি প্রয়োজনীয় মালপত্র এক বিরাট বোঝায় পবিণত হয়েছিল বেচারা সোহন সিং-এর কাছে। ন্যুব্জ হয়ে পড়া এক বৃদ্ধের মতো হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে সে আসছিল আমাদের অনেক পেছনে। তাই পথিমধ্যে তার পরিচিতি বড়ো একটা হয়নি। সে শুধু আমার ছোট্ট মেয়ে সীমার তাবিফ করছিল। ভূজবাসা এসেই বোঝা নামিয়ে সে একেবারে সটান শুয়ে পড়ল লালবাবাব আশ্রমপ্রাঙ্গণে। তার কী হয়েছে জানতে চাইলে সে তার শতচ্ছিন্ন কাপড়ের জুতো ডান পা থেকে খুলে দেখাতেই আমি আঁতকে উঠলাম। দেখলাম আগে থেকে জখম হওয়া তার পায়ের দগদগে ঘা দুর্গম পথের অত্যাচারে একেবারে সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। আমি তাকে বললাম, এ অবস্থায় তোমার কোনোমতেই গোমুখে আসা উচিত হয়নি।

ছলছল চোখে সে শুধু বলল, সাব, হামলোগ সব দেহাতমে রহতে হ্যায়। ওহা কাম-উন্ কুছ নহি মিলতা। ইস্‌লিয়ে য়হা আনা পড়া, কিউ কি গাঁও মে হামলোগ ভুখা রহতে হ্যায়। কমসে কম য়হাতো কুছ মিলতা হ্যায়, সাব।

সোহনের কথা শুনে আমারও চোখ ছলছল করে উঠল। আশ্রম থেকে গরম জল এনে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে সঙ্গে আনা মলম লাগিয়ে দিলাম তার দগদগা ঘায়ে। পরদিন সোহনকে ভূজবাসা রেখে গোমুখ যাওয়া স্থির করলাম মনে মনে।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই শিশুর মতো সরল হাসি হেসে সোহন বলে উঠল, সাব, দাওয়াসে হামারা বিমার বিলকুল ঠিক হো গয়া। জখমী হুয়ী জগাহ মে অভি কোই দর্দ হ্যায় নহি। অব ম্যায় চল সক্‌তা হুঁ। আপ কোই ফিকর মাত কিজিয়ে, সাব।

কী অদ্ভুত সারল্য এই পাহাড়ী মানুষগুলোর মনে! সামান্য উপকারে এরা চিরকৃতজ্ঞ থাকে। বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে গোমুখ চলল সে গুটি গুটি পায়ে। কিন্তু এই চার কি.মি. পথ অর্থাৎ ভূজবাসা থেকে গোমুখ পর্যন্ত আমি তাকে কোনো মোট বইতে দিইনি তার ক্ষতস্থানের কথা ভেবে।

ভূজবাসার পথ থেকে গোমুখ অবধি হিমালয় একেবারে ন্যাড়া। আগের মতো সবুজ বনানী তেমন চোখে পড়ে না। হিমবাহের একটি সুড়ঙ্গ পথের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান অবস্থায় গঙ্গা বেরিয়ে আসছে এই গোমুখে। তবে পাহাড়ী নদীর ধর্ম অনুযায়ী সমভূমির সামান্য একটা খালের মতো এই ধারাটিও খরস্রোতা ও গর্জনমুখর। ঘন্টাখানেক থাকার পর আমরা ফের রওনা দিলাম ভূজবাসা হয়ে গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে।

ফেরার পথে সোহন সিংহের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। এমনকি আমার ছোট্ট মেয়ে সীমার যে সাহসের কথা বলছিলাম, সেও চড়াই উৎরাইয়ের ধকল একটানা আর সহ্য করতে পারল না। মাঝে মাঝে তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হল আমাকে কাঁধে করে। যাবার পথে সবুজ বনানীঘেরা হিমালয়ের হাজার হাজার ফুট নিচে বয়ে যাওয়া, অলকানন্দার সেই গর্জনমুখর প্রবহমান সঙ্গীতকে ফেরার পথে শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে আর তেমন শ্রুতিমধুর মনে হল না।

চিরবাসা এসে অবসন্ন দেহে খানিক বিশ্রাম নিয়ে চা-টা খেয়ে.

আবার রওনা শুরু হল আমাদের। অনেকক্ষণ সোহনের অপেক্ষায় থাকতে হল। সে এসে পৌঁছতেই তাকে জলপানীর ব্যবস্থা করে আবার গঙ্গোত্রীর দিকে পা বাড়ালাম। সোহনের পায়ের অবস্থার ফের অবনতি হয়েছে। তাই তার বোঝার কিছুটা অংশ আমাকে বইতে হল। এইভাবে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে দুর্গম পথের ধকল সহ্য করে অবশেষে আমরা গঙ্গোত্রী ফিরলাম ৭ই সেপ্টেম্বর '৪৪ বিকেলের দিকে।

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে সে-রাত গঙ্গোত্রীতে কাটিয়ে আমরা অপেক্ষমান গাড়ি করে রওনা হব পরদিন কেদারের উদ্দেশে। ভোর হতে না হতেই সোহন সিং আমাদের ডেকে দিল। কেদার যাত্রার আগে সোহনকে তার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে তার ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য দিলাম কিছু ওষুধ আর মলম। কৃতজ্ঞতা ও সারল্যের ছাপ রেখে গেল সোহন সিং বিদায় নেবার কালে। কিন্তু রেখে গেল তার কান্না-ঘাম আর রক্তমাখা চিহ্ন পদে পদে এই গঙ্গোত্রী-গোমুখের চড়াই উৎরাই পথে।

৮ই সেপ্টেম্বর '৪৪ আমরা গঙ্গোত্রী থেকে কেদারের উদ্দেশে রওনা দিলাম। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে বৃষ্টি লেগেই ছিল। শেষ-মেষ চন্দ্রপুরী এসে এক বিরাট ধ্বসের মুখোমুখি হতে হল সবাইকে। সেখানেই সমস্ত যাত্রীদের রাত্রিবাস করতে হল একটি স্কুলে। আমরা সবার পেছনে থাকায় আমাদের ভাগ্যে ঘরও জোটেনি। তাই হিমালয়ের কোলে সেই স্কুল-বাড়ির বারান্দায় সমস্ত রাত কাটাতে হয়েছিল আমাদের। সৌভাগ্যের কথা বৃষ্টি হয়নি সে-রাতে! বৃষ্টি হলে নিউমোনিয়ার হাত থেকে রেহাই ছিল না কারো। এই স্কুল বারান্দাটি দখল নিয়েও আমাদের এবং অন্য যাত্রীদের খানিক বচসা হয়। জায়গা থাকতেও সেটা তারা ছাড়তে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্কুলকর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় তাদের একদিকে হটিয়ে আমাদের কোনোরকমে মাথা গোঁজার জায়গা করা হয়েছিল।

শুধু এই দেহাতী ভিন্নভাষী অন্য যাত্রীদের কথাই বা বলি কেন? আমাদের সঙ্গেও এমন দু' তিনজন ছিল যাদের নাম স্বভাবতই অনুল্লেখ থেকে গেছে। তাদের মানসিকতাও এদের তুলনায় বড় একটা ইত.-বিশেষ ছিল না। সামান্য হিসাব-নিকাশ, ক্ষুদ্র স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, টাকা-আনা-পাই-এর চুলচেরা বিচার এদের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল সব সময়। মানুষ যতটা ভ্রমণের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য এবং মানসিক প্রসারতার জন্য বাইরে বেরোয় তার বিন্দুমাত্র রেশ ছিল না এদের মধ্যে। এরা বাইরে বেরোয় সেই গুরুত্বের চাইতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফেরার পর তা সবার সামনে জাহির করার জন্য। এদের মন পাহাড়ে ওঠার চাইতে বরং পাতালে নামতেই বেশি পছন্দ করে। কাজেই সেই পাতালের কথা আপাতত পাতালেই চাপা থাক।

পরদিন চন্দ্রপুরীর ধ্বস পরিষ্কার হওয়ায় আমরা কেদারের দিকে রওনা হয়ে গৌরীকুণ্ডে এসে পৌঁছলাম। গৌরীকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে কিছু হাল্কা খাওয়া-দাওয়া সেরে হাঁটা পথে শুরু হল কেদারের যাত্রা। আজকাল অবশ্য বিত্তবান লোক ঘোড়া-ডাণ্ডি-কাণ্ডি-যোগে নির্ধারিত মূল্যে কেদার যেতে পারে। তবে পায়ে চলার আনন্দ পুরোনো দিনের মতো এখনো অটুট। তাই আমরাও পায়ে চলার পথ বেছে নিলাম। শুধু আমার ছোট্ট মেয়ে সীমার জন্য একটি কাণ্ডি ভাড়া করা হল তার বয়সের কথা চিন্তা করে। বিক্রম থাপা আমার ছোট মেয়েকে তার পিঠেবাঁধা কাণ্ডি করে নিয়ে চলল দুর্গম চড়াই পেরিয়ে কেদারের উদ্দেশে। পিছু পিছু আমরাও চললাম বিক্রম নির্দেশিত পথে।

হিমালয়ের অন্যান্য পথের তুলনায় কেদারের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এপথে শুধু চড়াই আর চড়াই—উৎরাই নেই বললেই চলে। একটানা চড়াই উঠতে কষ্ট হয়, বুক ধড়ফড় করে, এমনকি শ্বাসকষ্ট হয়। আমাদের সকলকে অনেক পেছনে ফেলে বিক্রম সীমাকে নিয়ে যেতে লাগল। সবার আগে এক সময় তার কাণ্ডি চলে গেল আমাদের

দৃষ্টির আড়ালে। আমার স্ত্রী তখন মেয়ের চিন্তায় অধীর। আমি তাকে যত বলি, পাহাড়ের লোকেরা বিশ্বাসী—কেউ কারো ক্ষতি করে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে আমাকে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও, দেখ ও কোথায় গেল। এই কথাগুলো বলতে যেটুকু সময় লাগে তার প্রায় দশগুণ সময় লাগল তার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করতে। এতেই বোঝা যায় শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে তখন তার অবস্থা কেমন! স্ত্রীর তাড়নায় আমি দ্রুত পায়ে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। শুরু থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। তাই সবাই বর্ষাতি চাপিয়ে এগোচ্ছিলাম। পিচ্ছিল পথে যেতে যেতে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় এবং সেই হেতু চলার গতি খুবই শ্লথ। তাছাড়া ওঠার ও নামার পথে ঘোড়া এবং খচ্চরের মলমূত্র নির্যাতিত পথ পদযাত্রীদের বিপদের প্রধান কারণ। পথি মধ্যে ঘোড়ার পেটের বর্ধিত অংশ আর এক সমূহ বিপদ, কারণ সংকীর্ণ পিচ্ছিল পথকে তারা আরও ভয়াবহ এবং আরও সংকীর্ণ করে তোলে। এই সব ভেবে আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমার মেয়ের জন্য। দ্রুত পায়ে উঠে দেখি জঙ্গলচটিতে মেয়েকে একেবারে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে বিক্রম হাসিমুখে সেখানে অপেক্ষা করছে।

হ্যাঁ, সেই বিক্রম থাপা, দেশ যার দার্জিলিং এবং সেখানে আছে তার বুড়ো মা-বাপ আর ছোট দুই বোন। এই সময় যে-টাকা সে আয় করে, তাই নিয়ে পাড়ি দেয় তার দার্জিলিঙের সুখিয়াপট্টীতে কালী পুজোর ঠিক পর পরই। কারণ তখন থেকেই সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে বন্ধ হয় তাদের রুজি রোজগার। তারপর পর্বত-বেষ্টিত আকাশের নিচে গুটি গুটি পায়ে নেমে আসে ভয়াবহ বরফের স্রোত।

জঙ্গলচটিতে অপেক্ষমান বিক্রম আমাকে দেখে হাসিমুখে বলল, সাব, ফিকর মাত্ কিজিয়ে। হাম বাচ্চীকো ঠিক সম্হালকে রাখেঙ্গে আউর পৌঁছ ভি দেঙ্গে। ওহ বিলকুল ঠিক হ্যায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে হাফাতে হাফাতে আমি চললাম বিক্রমের পিছু পিছু। মাঝে মাঝে ও সোজা খাড়াই বেয়ে পথকে সংক্ষিপ্ত করে নিচ্ছিল। তার অনুকরণ করতে গিয়ে আমার তো প্রাণান্তকর অবস্থা। শেষে বাধ্য হয়ে আমি তাকে বললাম, তুমি আর শর্টকাট করো না বিক্রম—তাতে বিপদের ঝুঁকি আছে। তুমি পড়ে যেতে পারো।

এক গাল হেসে বিক্রম বলল, সাব, আপ চিন্তা মাত কিজিয়ে। ম্যায় বিলকুল ঠিক হুঁ।

আমি বললাম, বিক্রম, চিন্তার কথা নয়—বিপদের কথা, আর বিপদ মানেই মৃত্যু।

কিন্তু বিক্রমের সেই এক কথা, আপ ফিকর মাত্ কিজিয়ে! ম্যায় বিলকুল ঠিক হুঁ।

রামবাড়া অর্থাৎ মাঝপথে আসার আগে বেশ বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের সবার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। তখন অসমসাহসী বিক্রমও ক্লান্ত দেহে উবু হয়ে একটা ঝর্ণা থেকে জিভ দিয়ে চেটে চেটে জল খেতে লাগল—ঠিক যেমন ট্রাম গাড়ির যুগে শ্রান্ত ঘোড়াগুলো কলকাতার রাস্তায় এখনো দৃশ্যমান নির্দিষ্ট পাত্র থেকে জল খেত। মহাকাশ যুগে একজন মানুষকে এমনিভাবে জল খেতে দেখে আমার প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। রামবাড়া পৌঁছে আমরা সবাই বিশ্রাম নিলাম। কাণ্ডি নামিয়ে বিক্রমকে আমি বললাম বিশ্রাম নিতে।

অক্সিজেন নেওয়া রোগীর মতো দম নিতে নিতে সে কাণ্ডি নামিয়ে বলল, সাব, কাণ্ডিসে ওহ লড়কীকো জারা উতার দিজিয়ে। শায়দ ওহ থক্ গয়ী।

জবুথুবু হয়ে বসা আমার মেয়ে কাণ্ডি থেকে নেমেই বলল, বাবা, আমার হাঁটুতে লাগছে।

কাণ্ডির ভিতর অনেকটা গভীর। তাই আমার কম্বল আর বিক্রমের চাদর দেওয়া সত্ত্বেও সীমার হাঁটুর ভিতর দিকটা হেলতে দুলতে বয়ে আনা কাণ্ডির ধারে লেগে লাল হয়ে উঠেছে। এদিকে

বিক্রমের কোনো বর্ষাতি না থাকায় তার অবস্থাও হয়েছে একেবারে কাহিল। তাকে একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সকলের সঙ্গে তারও এক গ্লাস দুধ আর চায়ের ব্যবস্থা করা হল। তারপর কিছু গরম ভাজী জোগাড় করে রামবাড়া থেকে কেদারের দিকে আমরা পুনরায় যাত্রা করলাম সবাই। এই পথের চড়াই আরো দুবিষহ। চলতে চলতে হাঁটুতে তো বটেই বুকের মধ্যেও একটা কষ্ট হয়। তারপর ঘনঘন নিঃশ্বাসের ফলে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে তালুতে বহুদিনের রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মতো একটা আস্তরণ পড়ে। দেহ অবসন্ন হওয়ায় মাঝে মাঝে বসে পড়ে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে হয়।

গৌরীকুণ্ড থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল তার আর বিরাম নেই। বিশ্রামের পর আমরা আবার চড়াই ডিঙিয়ে কেদারের দিকে এগুতে লাগলাম। সেই চিরাচরিত একদিকে খাড়াই পর্বত আর অন্য দিকে হাজার হাজার ফুট নিচে কলধ্বনি মুখরিত মন্দাকিনী। পদতলে সে কল্লোলীনীকে রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ শ্যামল ঘেরা হিমালয়। কারো কাছে নত হতে সে শেখেনি।

বৃষ্টি আরো জোরে এল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বৃষ্টিধারা যেন বর্শা-ফলকের মতো মুখে হাতে পায়ে বিঁধতে লাগল। নাইলনের মোজা এবং গ্লাভস্ বৃষ্টির জলে ভিজে একেবারে ঢাউস। একে পাহাড়ী শীত তারপর বৃষ্টি ; উপরন্তু হু হু করে বয়ে যাওয়া হাওয়া যেন আমাদের গ্রাস করতে উদ্যত হল। আমি বিক্রমকে বললাম, বিক্রম তুমি গাছতলা দেখে একটু দাঁড়াও। এর মধ্যে চলা সম্ভব নয়।

উত্তরে সে বলল, সাব, মাত্ ঠাহরিয়ে। ওহ দেখিয়ে মন্দির দিখাই দি যাতী হ্যায়। হামলোগ সব পৌঁছ গয়ে। জারা জলদি কিজিয়ে, সাব, জারা জলদি কিজিয়ে।

তাড়াতাড়ি বললেই কি আর তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ? ঝড় বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। এক্ষেত্রে গতি বাড়ানো মানেই বিপদ। সত্যিই তাই। আমি তো কোন ছার স্বয়ং বিক্রম থাপাও আর আগের

গতি ধরে রাখতে পারল না। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে আমরা কেদার পৌঁছলাম।

ভারত সেবাশ্রম সংঘে আমাদের স্থান হয়ে গেল অতি সহজেই। পৌঁছেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। রান্নার কথা উল্লেখ করতেই আমি বললাম, অনেক ধকল হয়েছে এখানে আর রান্নাবান্না করতে হবে না। কাজেই রমেন আর আমি বেরিয়ে পড়লাম খাবারের ব্যবস্থা করতে এবং আশ্রমের ক্যান্টিনে সেই রাতে খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হল আমাদের সকলের জন্য।

সোমা-লীনা বেরুল পাহাড়ের 'পরে বরফ দেখতে। সাবিত্রী আর দেবী গেল মন্দির-দর্শনে। রমেন এদিক ওদিক পাগলের মতো ছবি তুলতে ব্যস্ত। আর আমি মন্দির সংলগ্ন শঙ্করাচার্যের সমাধির পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরদিন আশ্রম-ক্যান্টিনে কিছু প্রাতঃরাশ সেরে আমরা রওনা দিলাম পুনরায় সেই গৌরীকুণ্ডের দিকে।

ফেরার পথেও বিক্রম থাপা পিঠে করে বয়ে চলল সীমাকে। যেতে যেতে তার সঙ্গে ছোট ছোট কথায় অনেক কিছুই প্রকাশ পেল। দার্জিলিঙের কথা, গাড়োয়ালের কথা—পাহাড়িয়াদের জীবনের কথা। শুনতে শুনতে পথের ছবিগুলো ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মতো চোখের সামনে ফুটে উঠল। ভেড়ার পাল নিয়ে তাড়িয়ে যাওয়া সেই পাহাড়ী যুবক আর সঙ্গে তার দেহরক্ষী ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুর; মাঝে মাঝে পথে লোমশ ভেড়ার লোম কাটারত সেই অভিজ্ঞ পাহাড়ী লোকেরা; ভুট্ট-বাজরা-রামদানা-বোঝা মাথায় দ্রুতপদে পথগামী সেই পাহাড়ী রমণী; বার বার বৃষ্টি মাথায় খড়কুটো বয়ে আনা সদাহাস্যময়ী সেই পাহাড়ী বয়স্কা নারী আর হাসিখুশি লুটোপুটিভরা ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের এদিক ওদিক আনাগোনা। এদের জীবনের সঙ্গে বিক্রমের জীবন একসূত্রে বাঁধা। তাই দার্জিলিং আর গাড়োয়াল তার কাছে 'বরাবর'। সেখানকার জীবনধারা যেমন দুঃখ-কষ্টে ভরা; এখানেও তাই।

শেষে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে যখন বিক্রমকে তার পাওনার অতিরিক্ত পনেরটি টাকা দিলাম। কৃতজ্ঞতায় সে আমার হাত দুটি চেপে ধরে বলে উঠল, বহুত সুকরিয়া, সাব, বহুত সুকরিয়া। তার অনবদ্য সারল্যে আমি অভিভূত। কাণ্ডি থেকে নামিয়ে আমার মেয়েকে সে কোলে করে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। এবং গাড়ি ছাড়ার পরও পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে মোড় না-নেওয়া পর্যন্ত তার হাসি-মুখ আমি একদৃষ্টে শুধু দেখতে লাগলাম। এক সময় বিক্রম চোখের আড়াল হয়ে গেল, কিন্তু রয়ে গেল তার স্মৃতি। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারের পথে পথে বিক্রমের কান্না-ঘাম-রক্তমাখা পথচলা আমার মনকে বার বার চঞ্চল করে তুলল।

১০ই সেপ্টেম্বর '৯৪ গৌরীকুণ্ড থেকে আমরা চললাম বদ্রীবিশালের দিকে। যেতে যেতে পিপলকোটির ২৫/৩০ কি. মি. দূরে মদ্যপ অবস্থায় দু'টি মাস্তান পাহাড়ী যুবক তাদের গাড়িসহ আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল। একজন আমাদের ড্রাইভার মোহন সিংকে খেঁকিয়ে উঠল, হামারা টায়ার ফাঁস গয়া। টায়ার কা ইন্তজাম করো। নহী তো ইয়ে বাঙ্গালি বাবুসে পানসো রূপয়ে কা বন্দোবস্ত করো। জলদি করো। ম্যায় নেই ছোড়ুঙ্গা। জলদি করো। য়ক্ত হামারা বহুত কম হ্যায়।

গভীর রাতে হিমালয়ের বুকে এই কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। লীনা, সোমা ভয়ে জড়সড়; রমেন, টুটু নিস্তব্ধ; সাবিত্রী ও দেবী তাদের যুবতী কন্যার কথা ভেবে ভয়ে আড়ষ্ট। তারা দু'জনেই একযোগে বলে উঠল, এখন কি হবে?

আমি মোহনকে জানাতেই সে বলল, সাব, আপ ফিকর মাত্ কিজিয়ে, আপ জারা চুপচাপ দেখতে রহিয়ে। ইয়ে সালেকো হাম দেখ লেঙ্গে।

যে কথা সেই কাজ। বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে সে দু'জনার কলার চেপে খেঁকিয়ে উঠল, ক্যায়ারে অন্ধেরামে কোনসা ড্রামা

হো রহা হ্যায়। হিরো বননেকা শখ হ্যায়? অগর কলাকার বননা হ্যায় তো বোম্বে যা। য়হা কিউ? আমাদের দ্বিতীয় ড্রাইভার তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, গাড়িমে অওরতিয়াঁ হ্যায়। বদনামী না হোগী? পিপলকোটি জানে দো। হামভি দেখ লেঙ্গে। বলেই সিংহ বিক্রমে দু'জনে ওদের গাড়ি রাস্তার পাশে রেখে তীরবেগে পৌঁছে গেল পিপলকোটি। আমরাও হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-কেদার-বদ্রী এর আগেও অনেকবার গিয়েছি; কিন্তু হিমালয় পর্বতের শান্ত স্নিগ্ধ বুকে মাস্তান-বিভ্রাট কখনো চোখে পড়েনি। ঘটনাচক্রে এবার কিন্তু তাদের দৌরাত্ম্য হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ করা গেল। পাহাড়ী মানুষ চিরকাল সারল্যের প্রতিচ্ছবি সততার বিমূর্ত প্রতীক—আমার সেই দৃঢ় প্রত্যয়ের মূলে এই প্রথম ঝটকা। সত্যসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে এই ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করছিলাম মনে মনে। ভাবলাম—সমস্ত পৃথিবী দূষণে দূষণে ছেয়ে গেছে আর তার কোনো প্রভাব হিমালয়ে পড়বে না সেটা তো হতে পারে না। তাই পরিবেশ দূষণের শিকার আজ দেবতাত্মা হিমালয় যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হরিদ্বারে ওষুধ প্রস্তুত কারখানা, টিহিরীতে দৈত্যাকার বিদ্যুৎ প্রকল্প! আর পরিবেশ দূষণের হোতা এই দূষিত মানুষ যেখানে প্রকৃতিকে দূষণে ভরিয়ে তুলেছে তার ছিঁটেফোঁটা প্রভাব তো অবশ্যই পড়বে এইসব সহজ সরল পাহাড়িয়াদের মধ্যে। শুধু বর্তমান সময় কেন সম্ভবত অনাদি অনন্ত কাল চিরস্থায়ী মূল্যবোধ বলে বোধ হয় পৃথিবীতে কিছু নেই। পৃথিবী ঘুরছে—আন্দোলিত হচ্ছে মানুষের বোধোদয়; তোলপাড় হচ্ছে মানুষের মন; মুখ থুবড়ে পড়ছে মানুষের চিরায়ত মূল্যবোধ।

যাক সেই কথা। মোহন সিং পিপলকোটিতে আমাদের একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। সেখানেই আমরা সবাই রাতটুকু কাটালাম কোনোক্রমে। ভোর চারটেয় আবার আমাদের রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে হল বদ্রীর উদ্দেশে। কারণ—তা না হলে ১২ই এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর '৪৪

বহুগুণাজী আহূত বন্ধ-এর ফাঁদে পড়তে হবে সবাইকে। যাহোক অবশেষে আমরা স্থাড়া পর্বতঘেরা বদ্রীবিশালের বুকে পৌঁছলাম বেলা আটটা নাগাদ।

পুণ্যলোভী সাবিত্রী এবং দেবী উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান সেরে ঢুকল মন্দিরপ্রাঙ্গণে। রমেন তার স্বভাবসুলভভাবে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করতে লাগল ক্যামেরা হাতে। লীনা, সোমা মন্দির সংলগ্ন সেতুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে গর্জনমুখর অলকানন্দার দৃশ্য দেখছে একান্ত নিবিষ্ট মনে। মন্দিরের অপর পাড়ে সারিবদ্ধ দোকানীরা হরেকরকম সামগ্রী নিয়ে সবে দোকান সাজাচ্ছে। নিজেরাই যার যার মালপত্র পিঠে বয়ে নিয়ে আসছিল অধিকাংশ পাহাড়ীয়ারা।

সমতলের একজনকে দেখে তার কাছে গিয়ে আমি বললাম, এই দোকান তোমার? সে উত্তর দিল, জী হা! খানিক আলাপ করার পর জানতে পারলাম মধ্যপ্রদেশের কোনো এক গ্রাম থেকে সে এসেছে এই বদ্রীতে। ভ্রাম্যমান পাখির মতো সেও কালীপুজো পর্যন্ত এখানে থেকে আবার ফিরে যাবে তার নিজ গ্রামে। সেখানে দু'ছেলে তিন মেয়েকে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে দিন যাপন করছে তার স্ত্রী। নাম তার প্রীতম চৌধুরী। আমি প্রীতমকে বললাম, আচ্ছা প্রীতম, তোমার স্ত্রী অতগুলো ছেলেমেয়েকে নিয়ে কী করে সংসার চালাচ্ছে? সে বলল, বাবু, ওহা থোরা খেতী উতী হ্যায়। আর হামভি য়হাসে কুছ ভেজতে হ্যায়। কই সুরতসে বদ্রীবিশাল কী কৃপাসে চল্ যাতা হ্যায়। তোমার ছেলে-মেয়েদের তুমি লেখাপড়া শেখাও না? আমার প্রশ্ন। উত্তরে সে বলল, দেহাতমে লিখাপড়া কা উতনা রেওয়াজ হ্যায় নহী, বাবু। আউর স্কুল জানেসে খেতী উতী কৌন সামহালেগা? আলাপী প্রীতমের দোকান থেকে পিতলের দুটি কামান এবং গোপালের মূর্তি কিনে তাকে বললাম, প্রীতম, আমরা আজই ফিরে যাচ্ছি। শুনে তার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। সাময়িকভাবে আমরা যতই বাইরে ভ্রমণের কথা বলি না কেন, ঘরে ফেরার তাগিদ কিন্তু মানুষের চিরদিনের। সেই

তাগিদ মর্মে মর্মে অনুভব করেই প্রীতমের মনে ঘরের ছবি ফুটে উঠল। যাবার সময় আমার হাত দুটি চেপে ধরে ব্যথিত গলায় সেও বলে উঠল, ম্যায়ভি লোঠুঙ্গা। এক মাহিনা বাদ ম্যায়ভি ঘর জাউঙ্গা।

১১ই সেপ্টেম্বর '৪৪ বদ্রী ছেড়ে আমরা ফিরে চললাম হরিদ্বারের দিকে। এর পরই দুদিন চাক্কা জ্যাম অর্থাৎ বন্‌ধ। বহুগুণাজীর দাবি —বিশাল উত্তরপ্রদেশ থেকে গাড়োয়াল-কুমায়ুনকে বিচ্ছিন্ন করে পাহাড়ীয়াদের জন্য একটি আলাদা রাজ্য করতে হবে যার নাম হবে উত্তরাখণ্ড। ফেরার পথে দেখা গেল মশাল-মিছিল আর তার পেছন পেছন সি. আর. পি. আর পি. এ. সি.। যদি কিছু ঘটে এই ভয়ে আমরা শিউরে উঠলাম। যা হোক তেমন কিছু হয়নি। আধা সামরিক বাহিনীবেষ্টিত মশাল-মিছিল নির্বিঘ্নেই এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

অন্ধকার পথ বেয়ে আমরা নিচে নামছি। যেতে যেতে মোহন সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মোহন, তুমি এই বন্‌ধ সমর্থন করো। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল, কিউ নহী সাব, বিলকুল মদত করতা হুঁ। আমার 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু বলল, সাব, আপ এক নজর প্লেনকী তরহ আউর এক নজর হিলকী তরহ জারা নজর রাখিয়ে। ফারাক আপহিকো মালুম হো জায়গা।

মোহন সিং-এর যুক্তি এতটা বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার অভিমানসুলভ বলার ভঙ্গিমা এতই দৃঢ়তাব্যঞ্জক যে, আমি তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। ফ্যালফ্যাল করে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলাম।

ব্যথা ভরা মন নিয়ে হিমালয়ের অন্ধকার বুক চিরে আমরা নিচে নামছি। গভীর নিশীথে চলন্ত গাড়িতে বসে হিমালয়ের স্তরে স্তরে আলো-আঁধারের ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য না দেখলে কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। সারারাত হিমালয়ের চড়াই উৎরাই বেয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর '৪৪ যখন আমরা হরিদ্বার পৌঁছলাম তখন ভোর চারটে। ভীমগোডায় জয়রাম আশ্রমে সেই রাতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল

আমাদের ড্রাইভার স্বয়ং মোহন সিং। গঙ্গার পারে অবস্থিত এই ধর্মশালা এখন হরিদ্বারের এক দর্শনীয় স্থান।

ফেরার দিন বিকেলে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বসে আছি। কলকল তানে বহমান গঙ্গাকে দেখতে দেখতে মনে হল যেন লক্ষ লক্ষ সোহন, বিক্রম, প্রীতম আর মোহনের কান্না-ঘাম-রক্তমাখা স্রোত মন্দাকিনী-অলকানন্দার সহস্রধারায় বয়ে প্রয়াগ-মিলন-সংহতি হয়ে হিমালয়ের বুক চিরে নেমে এসেছে এই হরিদ্বারে। এবং তারই মিলিত স্রোত বয়ে চলেছে ভারতের দিকে দিকে কোণে কোণে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কিংবা জনাকীর্ণ উর্বর ভূমিতে। স্তরে স্তরে থরে থরে পলিসঞ্চালিত এই ধারা এতই দৃঢ়বদ্ধ যে বাইরে থেকে তাকে মাঝে মাঝে শিথিল বা ঢিলেঢালা মনে হয়, কিন্তু তার শিকড় অনেক গভীরে। জাগ্রত শাশ্বত ভারতের বিমূর্ত প্রতীক এই গঙ্গা তার গীতিমুখরিত রবে বয়ে চলেছে দিগন্ত প্রসারী সমতল ভূমিতে চিরায়ত শুধু একটিই বাণী নিয়ে—আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো—চিরদিন, চিরকাল।

ওরা থাকে

হাওড়া স্টেশন থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে ১০-৪-১২ তারিখে রওনা হয়ে পরদিন সন্ধ্যাবেলা মাদ্রাস পৌঁছেই আমরা সপরিবারে আশ্রয় নিলাম হোটেল-ত্ত-কেরলে। পরিবার বলতে আমি, আমার স্ত্রী আর দুই মেয়ে। গাড়িতেই আমার ছোট মেয়ে সীমা ভেদবমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও পরের দিন ডাক্তারের পরামর্শে আশপাশ দৃশ্য দেখার সূচী হাতে নিতে হল আমাদের। কারণ অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসী অফিসের সহকর্মী-বন্ধু বন্দি মেরা দিন দশেকের এমন নিখুঁত ভ্রমণ-তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছিল যে, তার রদবদল বা তার মধ্যে দু-এক দিনের সময় ঢোকানো ছিল একেবারে অসম্ভব।

বস্তুতঃ মেরার সেই সুন্দর ভ্রমণ-সূচীর জন্যই অল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে দক্ষিণ ভারতের একটা বড় অংশ আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়েছিল। তাই পরদিন একটা অটোরিক্সা করে আমরা সমুদ্র-সৈকত, আন্নাসমাধিস্থল, এ্যাকুইরিয়াম বা মাছঘর, বিধানসভা ভবন, নাম্বিয়ার সমাধিক্ষেত্র দেখে মূল আকর্ষণ মহাবলীপুরমের দিকে রওনা দিলাম। সুবর্ণ সৈকত ধার দিয়ে মহাবলীপুরম যাবার অভিজ্ঞতা বড় মনোরম ও অতীত দিনের অনবদ্য শিল্পকর্ম দেখলে সবাইকে হতবাক হতে হয়।

মহাবলীপুরমের কঠিন পাহাড় কেটে কেটে করা মন্দির-গঠনে শিল্পীদের অনুপম শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র ইলোরার পাহাড়ের গায়ে বাটালির ঘায়ে কুঁদে কুঁদে করা সেই বিখ্যাত ভাস্কর্য ছাড়া ভারতের আর কোথাও এমনটি দেখতে পাওয়া যায় না। মহাবলীপুরমের শিল্প কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি শিল্পীরা। দ্রৌপদী সমেত পঞ্চপাণ্ডবের রথ তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল যার মধ্যে একটি মাত্র সমাপ্ত হয়েছে—বাকিগুলো অসমাপ্ত। কিন্তু অসমাপ্ত হলেও

হাতিটির শিল্পকর্ম এমন নিখুঁত যে, অসম্পন্ন অবস্থায় সমাপ্তিপর্বকে শিল্পী যেন তার যাতুবলে হার মানিয়েছে।

ফিরে এসে সেই দিনই (১২-৪-১১) মাদ্রাস সেনট্রাল থেকে আমরা একটা অটো ধরে মাদ্রাস এগমোর পৌঁছে রকফোর্ট এক্সপ্রেসে তিরুচিরাপল্লীর উদ্দেশে রওনা হলাম। পরদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিরুচিরাপল্লী পৌঁছেই আমরা স্টেশন সংলগ্ন সেলভাম হোটেলে আশ্রয় নিলাম। খাওয়া-দাওয়া এবং খানিক বিশ্রাম সেরে তিরুচিরা-পল্লীর মন্দির-দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম আমরা সকলে। পুরাণের দেবদেবীর মূর্তিখচিত বিশাল গোপুরম। মন্দিরের গর্ভপ্রকোষ্ঠে অনন্ত-শয্যায় শায়িত নাভিমূলে পদ্মডাটিসহ বিশাল অনন্ত নারায়ণের মূর্তি। অনন্তনাগিনী ছাতার মতো বিশাল ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মাথার 'পরে। সেখান থেকে পাহাড় দুর্গের উপরে তৈরি হিন্দুদের নানা দেবদেবীর মন্দির দেখলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয় বিশেষত প্রাচীন শিল্পের নমুনা দেখে। তবে পাহাড় দুর্গের এইসব মন্দিরের শেষ প্রান্তে উঠতে একটু দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয়।

পরদিন (১২-৪-১১) তিরুচিরাপল্লী থেকে মাদুরাই পৌঁছে আমরা নিকটেই কে. পি. এস. হোটেলে স্থান করে নিলাম। মাদুরাই-এর বিশাল মীনাক্ষী মন্দিরে সিংহবাহনা মীনাক্ষী দেবী বা দুর্গামূর্তি দেখে অভিভূত হলাম আমরা সবাই। তবে গোপুরম ঘেরা দক্ষিণ ভারতের মন্দির-গঠনে পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাই একটি মন্দির দর্শন করার পর পরের আর একটি দেখার তেমন একটা আগ্রহ থাকে না। পরদিন (১২-৪-১১) মাদুরাই থেকে তিরুনেনভিল হয়ে আমরা কন্যাকুমারী পৌঁছলাম বেলা বারোটা নাগাদ।

কন্যাকুমারী রেল স্টেশন থেকে বিবেকানন্দ পুরমের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। সেখানে পৌঁছেই আশ্রমে আমাদের স্থান সহজেই হয়ে গেল। সেদিন আশ্রমের আশপাশ এবং বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে বিবেকানন্দের জীবন-আলেখ্য দেখে পরদিন আমাদের কুটিরের পেছনে

খানিক দূরে সূর্যোদয় দেখলাম ভোর সাড়ে ছটা নাগাদ। তারপর কিছু খাওয়া দাওয়া সেরে আশ্রমের বাসে করে বেরিয়ে পড়লাম বিবেকানন্দ-শিলা দেখার উদ্দেশে।

কন্যাকুমারী-মন্দির, গান্ধীমণ্ডপ এবং শেষ শিলাখণ্ড দেখার পর লঞ্চে করে সারিবদ্ধভাবে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রইলাম মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য। মূল মন্দিরে প্রবেশ করে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের তেজোদীপ্ত মূর্তি দেখে সবাই অবাক হলাম। ভারতের উপকূলবর্তী পবিত্র বিবেকানন্দ-শিলার ওপর ভারত মহাসাগরের নীল জলরাশি আছড়ে পড়ে বীর সন্ন্যাসীর সেই দীপ্তিময় বাণী যেন ভারতবাসীর কানে স্বমহিমায় বার বার পৌছে দিচ্ছে—ওঠো, জাগো, অভিষ্ট লক্ষ্যে না পৌছনো পর্যন্ত থেমো না।

বিবেকানন্দ পুরমের গাড়ি করে পরদিন (১২-৪-১১) আমাদের কন্যাকুমারী স্টেশন পৌছানোর কথা। কিন্তু আশ্রমের গাড়িটি বিগড়ে যাওয়ায় ভোর চারটে পঁচিশ মিনিটে আমাদের রওনা দিতে হল আশ্রম থেকে। মালপত্র কম নিয়েই সাধারণত আমরা ভ্রমণে বেরুই। তাই আমার দুই হাতে দুটো সুটকেস, স্ত্রীর হাতে একটি ব্যাগ, বড় মেয়ের হাতে টুকিটাকি রাখার বটুয়া এবং ছোট মেয়ের কাঁধে জলের পাত্র নিয়ে আমরা চললাম রেল-স্টেশনের দিকে। আশ্রমের প্রবেশদ্বারও আশ্রম-প্রাঙ্গণ থেকে বেশ অনেকটা দূরে—তাই এই তড়িঘড়ি বন্দোবস্ত।

কুয়াশার আবছা আস্তরণ থাকায় রাস্তার ধারের বাতিগুলো টিমটিম করে জ্বলছে—অন্ধকার রাতে পথ চলার পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষম। মাঝে মাঝে দু'একটি মোটর গাড়ির হেড লাইটের তীক্ষ্ণ আলো সেই অন্ধকারের বুক চিরে শোঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় মেয়ে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, বাবা, তুমি একদম রাস্তার ধার ঘেষে চলো। আমিও সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, তোমরাও সাবধানে এসো। সীমাকে পেছন পেছন আসতে বল।

চারিদিক নিস্তব্ধ নিশ্চুপ। কোনো সাড়া নেই, কোনো শব্দ নেই। শুধু সমুদ্রের কিনারের বাতিঘর থেকে নিক্তিতে মাপা বৃত্তাকারে উৎসারিত আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে। দিনের বেলায় জনাকীর্ণ রাস্তা যে রকম সংকীর্ণ মনে হয়, রাতের বেলায় জনশূন্য সেই রাস্তাই যেন হা করে সবাইকে গিলতে আসছে! প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ আধ ঘণ্টায় পাড়ি দিতে হবে। তাই চলার গতিবেগ বাড়াতে হল সামনের দিকে চেয়ে। স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে পেছনে ফেলে আমি অনেকটা এগিয়ে গেছি এবং মাঝে মাঝে পেছন ফিরে ওদেরকে ইশারা করছি দ্রুত পায়ে হাঁটার জন্য।

হঠাৎ দেখি উল্টো দিক থেকে একটি লোক ধাই ধাই করে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে তার বলিষ্ঠ গঠন দেখে তাকে ষণ্ডা-গণ্ডা বলে মনে হল। তার পরণে খাকি ফুলপ্যান্ট আর খাকি শার্ট। মুখোমুখি কাছে এসে সেই লোকটি অকস্মাৎ আমার ডান হাতের সুটকেস ধরে বলে উঠল—হেল্প হেল্প!

অন্ধকার রাত। অপরিচিত স্থানে এক অপরিচিত লোকেব এই ব্যবহার দেখে আমার বুকের ভিতর কি রকম ডিবডিব করে উঠল। উপরন্তু পাশে দেখি সারি সারি ইউক্যালিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটখাটো জঙ্গলের মধ্যে। মফঃস্বল বাংলার লোক আমি। প্রথমেই তাই মনে হল এই ষণ্ডাগণ্ডা লোকটি ডাকব্যাকের সুটকেস নিয়ে যদি এই ইউক্যালিপটাস গাছের ভিতর দিয়ে দৌড় দেয়, তাহলে এই রাতে বিদেশ বিভূঁয়ে আমার কিছুই করার থাকবে না।

পরক্ষণে ভাবলাম—এখনো পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এসে কাউকেই অবিশ্বাসী বলে মনে হয়নি। তাছাড়া বিবেকানন্দ-শিলা দর্শন করার পর মনটাও কেমন যেন পাল্টে গেছে। অকারণে সহসা কাউকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

আমি লোকটাকে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি ভাষায় অনেক চেষ্টা করে জানতে চাইলাম—সে কে এবং এত রাতে কেনই বা সেখানে!

কিন্তু তার মাতৃভাষা তামিল ছাড়া সে কিছু বোঝে না—শুধু দু-একটি ইংরেজি শব্দ ছাড়া।

ইতিমধ্যে অন্যরা সব সেখানে এসে হাজির। আমার স্ত্রী বলল, এই অন্ধকার রাতে একজন অপরিচিত লোকের হাতে ডাকব্যাকের স্যুটকেস দেবে! ওর ভেতরেই তো আমাদের সব···

মা'র কথা শুনে সোমা বলল, বাবা, তুমি ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেছ! ওটা ওকে দাও। পৌঁছে বরং ওকে কিছু দিয়ে দিও। ছোট মেয়েও আমার কষ্টের কথা ভেবে বলে উঠল, হ্যা বাবা, তাই কর।

মেয়েদের কথামতো লোকটির হাতে স্যুটকেস তুলে দিতেই সে আমার বাম হাতের ব্যাগটিও অন্য হাতে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল হাসিমুখে।

বোঝাহীন হলে মানুষের যে কত স্বস্তি হয় ঘেমে নেয়ে যাওয়া শরীরে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। আর খালি হাত হওয়ায় আমিও এগিয়ে চললাম তার পিছু পিছু। মেয়েদের টুকিটাকি বোঝা হাতে আমার গতি তখন লপাং লপাং তালে।

ভোর পাঁচটার কিছু আগে আমরা সবাই কন্যাকুমারী রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। দিকচক্রবালে তত্ক্ষণে সবে ফুটিফুটি করছে আবছা উষার আলো। যাত্রী সংখ্যা খুবই কম। তাই সংরক্ষণ তালিকায় নাম দেখে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বগি খুঁজে বের করে নিতে তেমন বেগ পেতে হল না আমাদের।

কামরায় উঠে মেয়েদের কথামতো সেই লোকটিকে দশটা টাকা দিতেই সে আমার হাত দুটি ধরে মাথা নেড়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, নো নো—হেল্প হেল্প!

সেই কথা শুনে বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে শুধু তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম আমি। অনেকক্ষণ কোনো কথা বেরুল না আমার মুখ থেকে। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইল আমার মন।

মনে মনে ভাবলাম—অন্ধকার রাত সাড়ে চারটের সময় একজন ভিনদেশী পথিকের কষ্ট দূর করার জন্য এতটা পথ নিজের গন্তব্যস্থলের বিপরীত দিকে এসে তাকে সাহায্য করার কথা এই যুগে কেউ কল্পনা করতে পারে! প্রাথমিক মূল্যায়নে তাকে সন্দেহের তুলাদণ্ডে যাচাই করায় নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হল আমার। এবং সেই অপরাধবোধ মুহূর্তে সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ—রবীন্দ্রনাথের সেই কথা মনে পড়তেই সেই বিহ্বলতা আরও আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মনকে।

নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে সেই মানুষটি আমাদের সবাইকে হাসিমুখে বিদায় জানাল তার ডান হাত তুলে। আমরাও কামরার উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে তাকে বিদায় জানালাম হাত নেড়ে। এবং সে চোখের আড়াল হতেই আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠল এক অজানা কারণে।

হঠাৎ মনে পড়ল—তার নামটা পর্যন্ত জানা হয়নি। ভেতর থেকে সমস্ত শরীর মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল একটা অব্যক্ত বেদনা। পরক্ষণে মনে হল—নাম না জেনে বরং ভালোই হয়েছে। নামহীন অবস্থায়ই এরা মানুষের মধ্যে অবস্থান করে। এরা মানুষের হৃদয়ের গোপন কোটরে স্মৃতিমালার অত্যুজ্জ্বল মণি, যার আলো ঠিকরে পড়ে আমাদের এই পঙ্কিল সমাজে; যার দ্যুতি স্নিগ্ধমালার মতো শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয় আমাদের নরক জীবনে।

তীব্র বেগে রেলগাড়ি তামিলনাড়ুর সীমানা পেরিয়ে কেরলের মাটিতে প্রবেশ করল খানিক পরেই। ঘন নীল জলরাশি ঘিরে সবুজ সতেজ অরণ্য—মাথার উপরে নীলাকাশ। এই দৃশ্য দেখে মনে পড়ে গেল হুবহু বাংলার ছবি বিশেষ করে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার কথা। সারি সারি নারকেল গাছ সেই নীল জলরাশিকে প্রহরীর মতো বেষ্টন করে রেখেছে।

সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া এই নারকেল গাছগুলি যেন সেই মানুষটির

মতো পৃথিবীর মাটি ভেদ করে আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শীতল ছায়ায় কত নাম না-জানা অসংখ্য তরুলতা মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকে প্রণাম করছে; নীল জলরাশি কলধ্বনিসহ অবিরত তার পা ধুইয়ে দিচ্ছে আর মাথার উপরে নীলাকাশ দিগন্ত-প্রসারী ছাতা বিস্তার করে তাকে রক্ষা করছে পরম যত্নে।

ওরা থাকে—তাই চরৈবেতি মন্ত্রে পৃথিবী এগিয়ে চলে, অন্ধকার পথ কেটে কেটে আলোর বন্যা নিয়ে আসে। ওরা থাকে—তাই পৃথিবী চাঁদের আলোয় উথলে ওঠে, দিকচক্রবালে বিভোর আবেশ সৃষ্টি হয়। ওরা থাকে—তাই শিশুর মুখে হাসি ফোটে, মা তার বুকের নির্য্যাস নিঙরে প্রজন্মকে রক্ষা করে, বিবেক তার যাদুস্পর্শে স্বর্গের সুষমা এনে পৃথিবীর বুকে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেয়।

খেজুর গাছের কথা

দৈনিক পত্রিকা হিসেবে হাঁকডাক তেমন নেই। তবুও 'পয়গম' পত্রিকার নাম অনেকের জানা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে। আগে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন বেরুত, কিন্তু দিন দিন চাহিদা বাড়তে থাকায় আস্তে আস্তে ইদানিং দৈনিক পত্রিকা জগতে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

বিবেক রক্ষিত 'পয়গম' কাগজের বার্তা-সম্পাদক। অগোছালো কাগজের মতো অগোছালো তার চেহারা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথাভর্তি চুল, আর জরাজীর্ণ ব্যাগ কাঁধে। তবু কত বিচিত্র খবরই না থাকে তার ঐ ছোট্ট ঝুলিতে। সেইসব খবরের কটিই বা সে প্রকাশ করতে পারে তার নির্ধারিত কলামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে।

জীবনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বিবেক প্রায় দিশেহারা। সংসারে অভাব-অনটন, বস্তির নরক-জীবন এবং চারপাশের সর্পিল নোংরা পরিবেশ আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে অসহায় মানুষকে। বিবেকের জীবনও ব্যতিক্রম নয় এই পরিবেশ থেকে আর তার সাংবাদিক জীবনও বোধ হয় তথৈবচ—অন্তত সত্যনিষ্ঠ জীবন-জীবিকা অনুসন্ধিৎসার প্রেক্ষাপটে।

পশ্চিমবাংলা—রূপসী বাংলা—তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামের কোণে কোণে। গুটিকয় শহর দিয়ে বিচার করলে তার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। জীবনের প্রাণস্পন্দন যেমন ছড়িয়ে আছে দেহের কোটি কোটি জীবকোষের মধ্যে—বিশেষ কোনো জায়গায় তাকে খুঁজতে যাওয়া যেমন নির্বুদ্ধিতা—এও ঠিক তেমনি।

জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' বিবেককে প্রথম জীবনে খুব নাড়া দিয়েছিল। তার মন সব সময় বলত—বাংলার সবুজ মাটিতে ঘাস হয়ে জন্মালে তবেই এই ধরনের কবিতা লেখা সম্ভব। তাই সাংবাদিক

জীবনেও সে বেছে নিয়েছিল গ্রাম বাংলার বার্তা-সম্পাদকের দুরূহ কাজ।

এই দুরূহ দায়িত্ব নিয়েই সে একবার এসেছিল নদীয়া জেলার প্রান্তবর্তী এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে বুজে যাওয়া, মজে যাওয়া চূর্ণি নদীর ধারে। নদী না বলে বরং এটিকে বড়-সড় খাল বলাই ভালো। তবে তার নামটি বড়ই অদ্ভুত, বড়ই মনোরম—মমজান। বেনারস শব্দের মতো নামের মধ্যেও একটা কাব্যিক আদল!

মমজান গ্রামের মানুষগুলোকে দেখলে মনেই হয় না আমরা আধুনিক যুগে আছি—আমরা মহাকাশ যুগে বসবাস করছি। আধুনিক জীবনের বিন্দুবিসর্গ সেখানে চোখে পড়ে না। আদিম জীবনের পদধ্বনি যেন সেখানকার মানুষের চলার পথের নিত্যসঙ্গী। গরুর গাড়ির যুগকে আঁকড়ে ধরে তার পেছনে চিরকাল পড়ে থাকা যেন এখানকার মানুষেব নিরন্তর প্রবণতা। এক যুগন্ধর পুরুষই সম্ভবত পারে এইসব হতভাগ্যদের সেই নিকষ কালো তমস থেকে মুক্তি দিতে।

সারাটা জীবন সেখানে অভাব, দারিদ্র্য আর বঞ্চনার মধ্যে কাটাতে হয় মানুষকে। চলার পথের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে প্রায় সবাই হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ভাগ্যক্রমে যদি বা কেউ সেই সিঁড়ির দুটো তিনটে কিম্বা চারটে পাঁচটা ধাপ বরাত জোরে কোনোক্রমে উঠতে পারে; কিন্তু অনিবার্য পতনের হাত থেকে তার রক্ষা নেই। কারো পক্ষেই সেই সিঁড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে ওঠা সম্ভব হয় না।

শৈশবে শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে অস্থি-চর্মসার মায়ের বুক চাটে; কৈশোরে ছেলেমেয়ে লেখাপড়া না শিখে এ-বাদাড় সে-বাদাড় ঘুরে বেড়ায়; যৌবনে জীবন বয়ে আনে বিরাট শূন্যতা—নিঃস্ব হয়ে যাবার আগে কতগুলি নির্বোধ সোচ্চার আর নীরব আকুতি। যারা বেঁচে থাকে তারা সব এদিক ওদিক উঁকি মারে; পায়ে পায়ে নীচতার বেড়ি; ঘরের সুশ্রীতা মেশে নর্দমার নোংরা পঙ্কিলে। তবু সবাই ডুবে থাকে সেইখানে পাছে কোনো কিছু জানাজানি হয়

সংসারে সবার গোচরে।

বাস্তব লেখায় বিবেকের হাত ছিল অনেক দিনই। কিন্তু কেন জানি 'পয়গম' কাগজের বার্তা-সম্পাদক হবার পর বিবেকের মন লেখনীর রেশ টেনে ধরে। নির্মম বাস্তব মুখ থুবড়ে পড়ে সূর্যের প্রখর আলোকে। বিবেকের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কি এক বারতা ভেসে আসে—লজ্জা লজ্জাই থাক কী কাজ ঢোল পিটিয়ে।

তবুও লিখতে হয় সত্যের খাতিরে ছদ্মনামে ছদ্মবেশে। গ্রাম বাংলার কথা তুলে ধরে সবার সামনে অনাবিল অকপটভাবে খাঁটি সোনায় যাতে লোভী স্যাকরার পাঁচ মেশালী পাইন না মেশে।

পশুর মতন জীবন ধারণ করতে করতে মানুষের মন এখানে প্রায় বোবা হয়ে গেছে। এই বোবা জীবনের গতিপথ আশপাশের আপন শ্রেণীকে ছাড়িয়ে পশুপাখি পেরিয়ে শেষে গাছপালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক বিমূর্ত রূপ ধারণ করে। তারই আসল রূপটি বিবেকের লেখায় মূর্ত হয়ে ওঠে—

নল খাগড়ায় ঢাকা ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রায় মুছে যাওয়া এক মাঠের ধারে হাজা-মজা এক ডোবার পাশে ন্যুব্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি খেজুর গাছ। জারমানি লতায় সমস্ত গুড়ি তার আচ্ছন্ন। তাই আলতো বাতাসে কম্পমান তার শিখরদেশকে দূর থেকে সূর্যস্নাত এক অনুপম ফোয়ারার মতো মনে হয়।

শৈশব কেটেছে তার হাজা-মজা পচা-ডোবা নালা-নর্দমার ধারে আর পোকা-মাকড় মশা-মাছির আস্তানায় স্যাঁৎসেঁতে বিশ্রী দুর্গন্ধ নোংরা পরিবেশে। কিন্তু পাঁকের মধ্যে ফোটে গোলাপ—এই পরম সত্যটি প্রকাশ পেল গাছটির কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

কৈশোরের মুখে তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি—বোঝা যায়নি সে পুং কি স্ত্রী—গাছেদের মধ্যে যার নিতান্তই অভাব। যৌবন আসতেই কোনো এক মরদ এসে জোর করে তার দেহটাকে তছনছ করে নিঙরে সব রস নিয়ে গেল। দখিণা বাতাসে আলোড়িত ডালপালা দিয়ে

সে প্রথমে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল সেই পিশাচকে, ডেগোর গোড়ার সারিবদ্ধ তীক্ষ্ণ কাঁটা দিয়ে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিল সেই কামান্ধ দস্যুকে ; কিন্তু নারী জীবনের স্বাভাবিক দুর্বলতা হেতু রোধ করতে পারেনি তার নির্মম নিষ্ঠুর পেষণ।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেও হার মানল তার কাছে। নিজেকে বিলিয়ে দিল আর পাঁচজনের মতোই। অকৃপণে অকপটে বিশ্বাস করে ছিল সেই লম্পটকে তার বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক মায়া যাদুবলে তাকে আষ্টেপিষ্টে আবদ্ধ হতে হয়েছিল সেই অজগরী ভয়াল বেষ্টনে।

কিন্তু বছর পাঁচেক যেতে না যেতেই উধাও হয়ে গেল সেই লম্পট মরদ। কারণ সে এখন নিঃশেষিত নিষ্পেষিত। উজার করে দেবার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই তার কাছে। এতকাল ফিবছর সে জন্ম দিয়ে গেছে শত শত সন্তানেরে যারা তার মতই জরাজীর্ণ বিকলাঙ্গ নিঃস্ব রিক্ত। তবুও জোর করে মাকে আঁকড়ে ধরে থাকে তারা কোনো এক অমোঘ স্নেহের বন্ধনে।

প্রতি বছর কুরে কুরে খাওয়া তার গর্ভে লেগেছে বার্ধক্যের ছাপ। সামান্য হাওয়াতেই মাথা তার ঝিমঝিম করে—মনে হয় এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে ; হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পা দুটো তার থর থর করে কাঁপে—মনে হয় এই বুঝি কখন মট করে পড়ে যাবে কোমর ভেঙে ; একটু শিলাবৃষ্টি হলেই সারাটা শরীর তার শির শির করে ওঠে—মনে হয় এই বুঝি ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে ; আকাশে বজ্রের আনাগোনা হলে পরাণটা তার ছ্যাৎ করে ওঠে—মনে হয় এই বুঝি হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যাবে।

অসহায় সন্তানগুলো বাঁচার তাগিদে ছটফট করে খাবারের খোঁজে। মায়ের বুকে তাদের কচিকচি ডালগুলো নিয়ে বারবার আছড়ে পড়ে ব্যর্থ অনাদরে। অমানিশা বুকে বৃষ্টিভেজা রাতে টপটপ করে ঝরে পড়ে তাদের নীরব কান্নার অশ্রু।

তার শীর্ণ দেহে এখন আশ্রয় নিয়েছে কত পরগাছা, লতাপাতা, আগাছা-কুগাছা। প্রথম প্রথম প্রতিরোধ করেছে সে ক্ষীণ কণ্ঠে মিহি সুরে নিজের অসহায় দুঃস্থ সন্তানদের কথা ভেবে, কিন্তু পারেনি বার্ধক্যের গুরুভারে!

তারপর অবশেষে একদিন চিরশান্তি পেল সে এক দস্যুর হাতে। তার মরা হাড়ে কী হবে কে জানে! খণ্ড খণ্ড করে ওকে কেটে নিয়ে গেল সেদিন যমদূত প্রায় সেই ষণ্ডাগণ্ডা। শুধু রেখে গেল ভাঁজপরা ছিন্ন-ভিন্ন দেহ আর একরাশ চুলসহ তার চোখ ওলটানো মাথা। মরা দৃষ্টি পড়ে থাকে শুধু অসহায় সন্তানের দিকে চেয়ে—প্রজন্মের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।